বাতায়ন

উৎসবের রেশ

“রাত্রি হইবে শেষ, উষা আসি ধীরে
দ্বার খুলি দিবে তব ধ্যানমন্দিরে ।

জাগিবে শক্তি তব নব উৎসবে,
রিক্ত করিল যাহা পূর্ণ তা হবে ।

ডুবায়ে তিমিরতলে পুরাতন দিন
হে রবি, করিবে তারে নিত্য নবীন ।”

বাতায়ন

সম্পাদনা
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৫

EDITOR
Ranjita Chottopadhyay, IL, USA

COORDINATOR
Biswajit Matilal, Kolkata, India

DESIGN AND ART LAYOUT
Kajal & Subrata, Kolkata, India

PHOTOGRAPHY
Soumen Chottopadhyay, IL, USA
Tirthankar Banerjee, Perth, Australia

PUBLISHED BY
Neo Spectrum
Anusri Banerjee, Perth, Australia
E-mail: a_banerjee@iinet.net.au

বাতায়ন পত্রিকা বাতায়ন কমিটি দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । বাতায়ন কমিটির লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Published by the BATAYAN of Neo Spectrum, Perth, Australia. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editor is not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সূচীপত্র

উৎসবের রেশ

Christmas, 2015 — Viola Lee ২
ক্লীভ্ল্যান্ডের দুর্গাপুজো — সুজয় দত্ত ৩
বিচিত্র দেবতা কার্তিক ঃ সংস্কৃতি ও ইতিহাসে — ড: স্বপনকুমার ঠাকুর ৫
পুজোর শহর কলকাতা – একটি প্রতিবেদন — বিশাখা দত্ত ৯

অনুবাদ

Das Lied des Idioten — Rainer Maria Rilke ১১
The idiot's song (Translation in English) — Dhiman Chakraborty ১২
পাগলের গান (Translation in Bengali) — Dhiman Chakraborty ১২
ফুটবল — আলপনা গুহ ১৩

গল্প

পাখী — সুজয় দত্ত ১৬
স্মৃতি — বানী ভট্টাচার্য্য ২২

প্রবন্ধ

সেই চেনা / অচেনা পাখিটা — শাশ্বতী ভট্টাচার্য ২৪
ওঁ থেকে ও-মারিয়া — সুভাশীষ মুখার্জী ২৭

জানালা দিয়ে

The Redbud — Jill Charles ৩০
Albany Park — Jill Charles ৩০
The Wind Pipe — Abhijit Mukherjee ৩১
"তবু তুমি নেই" — সুপর্ণা চ্যাটার্জী ৩২
I Will Rescue You — Jill Charles ৩৩
The Roadside Weaver — Indrani Mondal ৩৬
The Street Venders — Indrani Mondal ৩৭
লিমেরিক — শুভ্র দত্ত ৩৮

চিত্র সমালোচনা

'বেলাশেষে' — সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৩৯

Acknowledgement:

Thank you to all the contributors to our second issue of ‘BATAYAN’. We also thank every one for being with us, trusting us and providing us moral support. Your overwhelming response and comments are leading us to challenging 2016. We could not have done it without your support.

Batayan Team

সম্পাদকীয়

বাঙলা ও বাঙালীর বড় বড় পালা পার্বণ সবে শেষ হয়েছে। ঢাকের বাজনা গেছে থেমে। দীপালিকার আলোও প্রায় স্তিমিত। তাই বলে উৎসবের দীপবর্ত্তিকা নিভে গেছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। আজকের এই বিশ্বায়নের দিনে বিশ্বজোড়া নানা উৎসবের সামিল আমি আপনি সকলেই। আমাদের ঘর এখন শুধু নিজের জন্মভূমির ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। গোটা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে আছে আমাদের আত্মার সম্পর্কের আত্মীয়জনেরা। আসছে বড়দিন, শুরু হচ্ছে ২০১৫ সালকে বিদায় জানিয়ে ২০১৬ সালকে অভিবাদন জানানোর প্রস্তুতি। সকলে তাই আনন্দে মাতোয়ারা। অনেকেই ব্যস্ত আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে বড়দিনের ছুটিটা হৈ হৈ করে কাটানোর পরিকল্পনায়। পশ্চিমবাংলায় এই সময়টি খাওয়া, বেড়ান, ঘোরা ইত্যাদির জন্য আদর্শ সময়।

এ তো গেল মানুষের আয়োজিত উৎসবের কথা। কিন্তু জগতের আনন্দযজ্ঞে আমাদের সকলের সবসময় নিমন্ত্রণ। সে উৎসবের সামিল আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে। আসলে বেঁচে থাকার অপর নামই হল উৎসব। তাই উৎসবের রেশ সবসময় লেগেই থাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর চাপে এই বোধ অনেক সময় হারিয়ে যায়। তবে তখনই নতুন করে জীবনের প্রতি আস্থা ফিরে আসে ঋষিকবির বাণীর উপলব্ধিতে —

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।

তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।'

'তবু প্রাণ নিত্যধারা - - - ' এই নিত্য প্রাণের প্রবাহে অবগাহন করে বিগত দিনের লাভ লোকসান, ক্ষয়ক্ষতি ভুলে আসুন আমরা আরো একবার জীবনের জয়গান গেয়ে উঠি।

বছরের শেষে আপনাদের জন্য বাতায়ন পত্রিকার পক্ষ থেকে আমাদের উপহার-'উৎসবের রেশ' নিয়ে বাতায়ন ডিসেম্বর সংখ্যা। ২০১৫-র বাকী দিনগুলোতে শান্তি, সুস্থতা ও নিরাপত্তা ঘিরে থাক আপনাদের জীবন। সকলে ভাল থাকবেন। আনন্দে থাকবেন। বাতায়নের আগামী সংখ্যাটি কেমন লাগল জানাতে ভুলবেন না। এই বছরে আপনাদের সকলের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়ে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে বাতায়ন। আশা রাখি আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হবে না।

শুভেচ্ছাসহ

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Christmas, 2015

Viola Lee, Chicago

I have tried many times to write a poem
a poem of thanksgiving for all those things
that are a part of this world,
but each time the poem never works.

It always ends up broke
left sitting still on the branches in front of the house
with the ice and the sleet
or somewhere entwined
in the ropes of the spider park down the street
or in traffic on the interstate
crumbled piece of paper
a note wet with rain
stamped with tire markings.

I have tried many times to write a poem
that prefers trying indoors
where it is warm with everyone
with all those now waking
and jumping into bed with us.

A poem that becomes the knife cutting
all those green beans
that we will take over
to my sisters house for dinner tonight.

Early dinner because everyone has children
and we all need sleep,
A poem that becomes
the noise in the living room:
the television, that one more episode of Arthur,
the xylophone that bangs and bangs on and on
those little fingers at work
one day writing out our eulogies
A poem that becomes that warm cup of coffee
and that little bit of rice milk left
that spoonful of brown sugar
and that huge shout out
to that person who just handed the cup to me.

That poem will become
all those who take part in providing me
with this cup coffee every morning,
for my parents who made
these lips and throat and stomach, body
for all those who have helped to
design this French Press
this one style that I love so much
and curse often

for the drivers and farmers and workers and rosters
for the counties that continue
to make all of this
continue to design this French Press,
for the crying that I hear in my living room,
for the nursing that I have managed to do
for the past eight months
and how each day I say,
will this be the last,
and yet, how this growing being,
needs it to happen right at this second,
for the fact that my body just does it naturally,
makes this milk and keeps a human being alive,
how it is both a miracle and science combined,
and how it is an absolute mystery–
when other infants cry
and what the crying does to my very own body.

উৎসবের রেশ

ক্লীভ্‌ল্যান্ডের দুর্গাপূজো

সুজয় দত্ত, Ohio, USA

মহামায়া এসেছেন ওহায়োর প্রান্তে —

শরতে শীতের ছোঁয়া কেমন, তা জানতে।

আমেরিকার পঞ্চহ্রদের চতুর্থটির, অর্থাৎ লেক এরির তীরবর্তী ক্লীভ্‌ল্যান্ড শহরে উত্তর ওহায়োর বৃহত্তম বঙ্গসমাজ তাদের বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থার (Bengali Cultural Society) প্রতিষ্ঠা করেছিল আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে। প্রথম দুর্গাপূজো আয়োজন করতে অবশ্য লেগেছিল আরো সাত বছর। ১৯৭৮ সালে শুরু হওয়া সেই পূজোর এবার ছিল আটত্রিশতম বর্ষ। ক্লীভ্‌ল্যান্ডের সুপরিচিত কেস্‌ ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের অদূরে ইন্ডিয়া কমিউনিটি সেন্টার নামক একটি ঐতিহ্যময় বাড়ীর বিশাল হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় এই চারবেলার উৎসব। শুক্রবার সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়ে শনিবার সারাদিন চলার পর শেষ হয় রবিবার বিকেলে।

তবে উৎসব চারবেলার হলেও, বলাই বাহুল্য, তার প্রস্তুতি শুরু হয় বেশ কিছুদিন আগে। মঞ্চসজ্জা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৈবেদ্য থেকে নৈশভোজ, পূজোর নির্ঘন্ট থেকে শারদপত্রিকার সূচীপত্র — প্রতিটা খুঁটিনাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একের পর এক মিটিঙে। নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয় স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে তৈরী ছোট ছোট সাব্‌কমিটির ওপর। অবশেষে ঘনিয়ে আসে সেই বহুপ্রতীক্ষিত সপ্তাহান্ত। বৃহস্পতিবার রাতেই প্রতিমা আনা আর মঞ্চ সাজানোর কাজ শেষ। পূজোর প্রথম দিন অর্থাৎ শুক্রবার সন্ধ্যায় লোকসমাগম শুরু হতে একটু দেরী হয়, কারণ অফিস থেকে বাড়ী ফিরে সেজেগুজে তৈরী হওয়ার সময়টুকু তো চাই। তাই ঐ দিন ষষ্ঠীপূজো আর কচিকাঁচাদের নাতিদীর্ঘ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু হয়না। এবং অবশ্যই লোভনীয় খাওয়াদাওয়া। ছোটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কী আর এমন হাতিঘোড়া হবে — এই ভেবে যাঁরা আসেন না, তাঁরা কিন্তু ঠকেন। কারণ ক্লীভ্‌ল্যান্ডের শিশুশিল্পীদের পরিবেশনার মান সামগ্রিকভাবে মোটেই হেলাফেলার যোগ্য

নয়। আর তাদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ মহড়ায় হাজির করতে বাবা-মায়েদের উৎসাহও অফুরন্ত। শুক্রবার বাড়ী ফিরতে রাত হলেও শনিবার সকাল থেকেই আবার পূজোর ঢাকে কাঠি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে ভীড়। অভ্যাগতদের সংখ্যা চারশো ছাড়িয়ে যায়। একে একে হয় সপ্তমীর পূজো, অষ্টমীর পূজো আর পুষ্পাঞ্জলি। সকলের আলাপচারিতা, আড্ডা আর খোশগল্পের সমবেত গুঞ্জন ছাপিয়ে লাউড স্পীকারে গমগম করতে থাকে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ। হলঘরের একদিকের দেয়াল জুড়ে পসরা সাজিয়ে বসা শাড়ি-গয়নার স্টল আর অন্যদিকে 'মুক্তধারার' টেবিলে একরাশ পূজোবার্ষিকীর সমারোহে চারিদিকে কেমন একটা মেলাপ্রাঙ্গনের আবহ। পুষ্পাঞ্জলি হয় দফায় দফায়। যতবার পুরোহিতমশাই বলতে চান এটাই শেষবার, ততবারই দেখা যায় কিছু পুণ্যার্থী বাকী পড়ে গেছেন। অতএব আবার সেই গোড়া থেকে —।

অঞ্জলির এই পৌনঃপুনিকতা শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু পড়ে যায় লম্বা লাইন। প্রসাদের। ওদিকে দ্বিতীয় আর তৃতীয় প্রজন্মেরও তখন 'হাংরি' হবার সময় হয়ে গেছে। তারা তাদের বাঁধাধরা পিৎজা আর পাস্তার প্লেট হাতে নিয়ে ইতস্তত‌ঃ ছোটাছুটি করতে থাকে (বা বলা ভাল তাদের মায়েরা

প্লেট হাতে তাদের পিছনে ছোটাছুটি করতে থাকেন খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করতে করতে) । এই পর্ব মিটলে অবশেষে বড়দের মধ্যাহ্নভোজ । ক্লীভল্যান্ডের বাঙালীমহলে রন্ধনশিল্পে নৈপুণ্যের অভাব নেই । পূজোর দিন দুপুরে তার সুস্বাদু প্রমাণ সবার জিভে লেগে থাকে, কারণ দুপুরের খাওয়াদাওয়ার প্রতিটা আইটেম্ই বাড়ী থেকে রান্না করে আনা । এই রসনাতৃপ্তির আমেজ মুখে নিয়ে বিকেলে বাড়ী ফিরে যান সবাই -- ঘন্টাকয়েক বিশ্রামের পর নতুন উদ্দীপনা আর নতুন সাজপোশাকে সান্ধ্য উৎসবে যোগদানের জন্য । সন্ধ্যাবেলায় আরতি আর নবমী-পূজোর পর বড়দের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । মাঝে মাঝে বহিরাগত শিল্পীরা আমন্ত্রিত হয়ে এলেও পূজোর এই সান্ধ্য বিচিত্রানুষ্ঠানে স্থানীয় কলাকুশলীদেরই রমরমা । আসলে ক্লীভল্যান্ডের বাঙালীরা রাঁধেনও যেমন দারুণ, চুলও বাঁধেন সেই রকম । অর্থাৎ নাচ-গান-আবৃত্তি-হাস্যকৌতুকে আসর মাতিয়ে দেওয়ার এলেম রাখেন — এমন অনেকেই আছেন এখানকার বঙ্গসমাজে । কারাওকে-স্টাইল ট্র্যাক্ মিউজিকের সঙ্গে মাইক হাতে নিয়ে তাঁরা মুহূর্তে হয়ে যান কিশোর থেকে মান্না, কিংবা লতা থেকে আশা । সাংস্কৃতিক ভুরিভোজ শেষ হতে না হতেই আবার পেটপূজো । নৈশভোজের খাবার অবশ্য আসে কোনো জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ থেকে । সুদীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে জিভে জল আনা সেইসব চর্বচোষ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার পর শেষপাতে মিষ্টিমুখ দিয়ে সেদিনের মতো মজলিসে ইতি । ছত্রিশ ঘন্টা বাদেই আবার অফিস-ইস্কুলের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যস্ততা — একথা ভাবলেই বাড়ীমুখো বাঙালীর মনে সুদূর কলকাতার নবমী-নিশীথে শেষবারের মতো আনন্দে মাতোয়ারা জনতার মতো একটা চিন্‌চিনে ব্যথা হয়তো বারবার বলতে থাকে, ‘ইস্, আর মাত্র একটা দিন !’

সেই একটা দিনের জন্যও অবশ্য তোলা থাকে অনেক কিছু । রবিবার সকালে দশমী-পূজো, বিসর্জন আর দধিকর্মার পর বসে বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থার বার্ষিক সাধারণ-সভা । যে কমিটি সেই জানুয়ারীর সরস্বতীপূজো থেকে দায়িত্বভার সামলে আসছে, তারা বিগত দশমাসের আয়ব্যয়ের হিসেব পেশ করে । তাদের সারা বছরের সাফল্য-ব্যর্থতা আর সংস্থার সামগ্রিক হাল-হকিকত নিয়ে টুকরো আলোচনা আর মন্তব্য-বিনিময় চলে । আর তারপর কী হয়, সেটা বলতে পারার জন্য কোনো পুরস্কার নেই । কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া ছাড়া বাঙালীর উৎসবের ল্যাজা-মুড়ো-ধড় — কোনোটাই কি কল্পনা করা যায় ? অতএব আবার মধ্যাহ্নভোজের লাইন । সেই পর্ব মিটতে না মিটতেই ‘ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ? ঠাকুর যাবে বিসর্জন’-এর তালে তালে বেজে ওঠে ঢাক, শুরু হয় ধুনুচি নাচ । মহিলারা দেবীপ্রতিমাকে বরণ আর মিষ্টিমুখ করিয়ে নিজেদের মধ্যে সিঁদুর খেলায় মাতেন । আর সারা হলঘর জুড়ে চলতে থাকে বিজয়ার প্রীতি-শুভেচ্ছা বিনিময় । যাঁদের সঙ্গে সেদিন মুখোমুখি দেখা হল না, তাঁদের সঙ্গে প্রণাম আর কোলাকুলির সুযোগ পেতে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহান্তের লক্ষ্মীপূজো, কালীপূজো আর বিজয়া সম্মিলনীর জন্য অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া গতি নেই ।

এদেশের অন্যান্য যেসব বড় বড় শহরে যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালীর বাস, তাদের মতো ক্লীভল্যান্ডেও বাঙালীসমাজ সারা বছর প্রচন্ড পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যে মেলামেশা আর নির্ভেজাল আড্ডার টুকরোটাকরা উপলক্ষ্য তৈরী করে নেয়। কিন্তু দুর্গোৎসবের সঙ্গে কি আর ওগুলোর তুলনা চলে ? তাই বাঙালী শারদোৎসব পালন করে, না শারদোৎসবই বাঙালীর বাঙালিত্বকে লালন করে, তা নিয়ে তর্কটা চলতেই থাকবে ।

উৎসবের রঙ্গ

একই অঙ্গে কত রূপ

বিচিত্র দেবতা কার্তিক ঃ সংস্কৃতি ও ইতিহাসে

ড: স্বপনকুমার ঠাকুর, Burdwan, West Bengal

রহস্যময় দেবচরিত্র দেবসেনাপতি কার্তিক। অগ্নিদেবতা, যুদ্ধদেবতা, কখনো বা প্রজননের দেবতা। বারঙ্গনা, চোরদের দেবতা হিসেবেও একসময়ে পূজিত। শুধু অবিভক্ত বাংলাদেশ নয় — কার্তিক উপাসনা অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ছাড়িয়ে শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলা বারোমাসের একটি মাস তাঁর নামে চিহ্নিত। বহুবিচিত্র নামমালায় নন্দিত; স্কন্দ-বিশাখ, গুহ, কুমার, ষণ্মুখ, ষড়ানন, মুরুগণ, সুব্রহ্মণীয়ম ইত্যাদি। স্কন্দপুরাণে এইরকম ১০৮টি নামের প্রতিশব্দ আছে। বোঝা যায় তাঁর জনপ্রিয়তার ব্যপ্তি আর বিশালতা।

পার্বতীতনয় ময়ূরবাহনা সুদর্শন কার্তিক। সুঠাম চেহারা। মাথার চুল কুঞ্চিত, বাবরি করা। সরু গোঁফ। দুধে আলতা গাত্রবর্ণ। পরণে সুদৃশ্য চিত্রিত জ্যাকেট। ফিনফিনে পাতলা শান্তিপুরি ধুতি। পায়ে নাগরা জুতো। হাতে যুদ্ধাস্ত্র; তীর ও ধনুক। তুলনা করলে এসে যায় উনিশ শতকীয় জমিদার বাবুদের রূপকল্প। সাধে কি আর বলতো ঃ বাবুরা ময়ুর ছাড়া কার্তিক !

ঋগ্বেদে কার্তিকের উল্লেখ নেই। অথর্ববেদে কুমার নামে আগুনদেবতার সন্ধান মেলে। তিনি অগ্নিভূ অর্থাৎ অগ্নিপুত্র। শতপথ ব্রাহ্মণে কুমার আবার রুদ্রপুত্র নামে পরিচিত। বৈদিক যুগের শেষের দিকে কুমার ক্রমশ শৈবসাধনায় যুক্ত। এই কারণে রুদ্রপুত্র। পার্বতীতনয়।

বায়ু, বামন, পদ্ম, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে, রামায়ণে ও মহাভারতে কার্তিকের জমজমাট জন্মবৃত্তান্তটি বেশ ফলাও করে লেখা। পৌরাণিক ঐতিহ্যে কার্তিক একদিকে শিব ও পার্বতীর পুত্র। অন্যদিকে অগ্নি ও স্বাহার আত্মজ। প্রথমটি শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্যে। যেমন কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে।

কালিকাপুরাণে আছে — গৌরী আর মহাদেব মহাসঙ্গমে রত হলেন। সুদীর্ঘ বত্রিশটা বছর ধরে চলল সেই সঙ্গম। পৃথিবী উঠল দুলে। ফুলে উঠল সাগর। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র

বাঁশবেড়িয়ায় অনন্ত বাসুদেব টেরাকোটা মন্দিরে খোদিত কার্তিক ফলক

ভাবলেন ঐ বুঝি গৌরীপুত্র তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে। দেবতাদের সঙ্গে ফন্দি করে শিব গৌরীর সঙ্গম ভঙ্গ করা হল। শিবের বীর্য গ্রহণ করলেন অগ্নি। নিক্ষেপ করলেন আকাশগঙ্গায়। জন্ম নিল ফুটফুটে সুন্দর দুটি শিশু — স্কন্দ আর বিশাখ। দুই শিশু এক হয়ে কার্তিকরূপে ধাবিত হল তারকাসুরকে বধ করতে।

মহাভারতে আরও মজাদার কাহিনী। সপ্তর্ষি নক্ষত্রপত্নীদের সম্মুখে বশিষ্ঠমুনি। অন্যান্য দেবতাদের সহায়তায় যজ্ঞ করছেন। অগ্নি হব্য গ্রহণকালে যৌবনবতী ঋষিপত্নীদের দেখে কামমোহিত হয়ে পড়লেন। দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন অগ্নিপ্রণয়ী স্বাহা। তিনি তখন অরুন্ধুতীকে বাদ দিয়ে বাকি ছ'জন ঋষিপত্নীর রূপ ধরে অগ্নির সঙ্গে মিলিত হলেন। মিলনের ফলে এক ভয়ঙ্কর দেবপুত্রের জন্ম হল। ছয়টি মাথা, বারোটি হাত। দেবরাজ ইন্দ্র প্রচন্ড ভয় পেয়ে বজ্র দিয়ে সেই দেবতার স্কন্ধে আঘাত হানলেন। আঘাতপ্রাপ্ত দেবতার নাম হল বিশাখ। এদিকে ঋষিরা তাঁদের

জমিদার কার্তিক (লৌকিক নাম) সাতভাই কার্তিক

স্ত্রীদের কলঙ্কিনী, দুশ্চরিত্রা ভেবে তাড়িয়ে দিলেন। কার্তিক এই ছয়নারীকে মা বলে আপন করে নিলেন। এঁরা কৃত্তিকা নামে পরিচিত। সেই সূত্রে স্কন্দবিশাখের নাম হল কার্তিক।

জন্মবৃত্তান্তে ঋষিপত্নী বা গণিকা প্রসঙ্গ, ইন্দ্রকতৃক নিগ্রহ আবার নিজকন্যা দেবাসেনাকে প্রদান- এইসমস্ত ঘটনাগুলি কি বিলুপ্ত কোনো প্রাচীন ইতিহাস তথা সংস্কৃতির আপাত পারম্পর্যহীন রেখাচিত্র ? এর থেকে নান বিষয় অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যয়ী সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তবে প্রাচীনকালে মাতৃকারা (পড়ুন গণিকারা) শিশুহন্তারক ও নিগ্রহকারী ছিলেন। এমন ইঙ্গিত প্রাচীন গ্রন্থে মেলে। স্কন্দকার্তিক মাতৃকাগণের ক্ষোভ প্রশমিত করে শিশুরক্ষক দেবীতে পরিণত করেন। লৌকিকমতে কার্তিকের বিয়ে হয়েছিল এমনই এক শিশুরক্ষক লৌকিকদেবী ষষ্ঠীর সঙ্গে।

প্রকৃতপক্ষে কার্তিক লোকজ স্তর থেকে উঠে আসা দেবতা। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে স্কন্দ কার্তিককে ভয়ঙ্কর লৌকিক দেবতা বলা হয়েছে। তার ছয়টি মুখের মধ্যে একটি ছাগমুন্ড। অনেকের মতে ছাগ প্রাচীন অগ্নি-উপাসকদের প্রতীক। আবার বাহন হিসেবে ময়ূরের আগে ছিল কুক্কুট অর্থাৎ মোরগ। এই প্রাণীটিও প্রাচীন অগ্নি বা সূর্য উপাসকদের কাছে অতি পবিত্র। সূর্যের উদয়বার্তা ঘোষণা করে মোরগের ডাক। ল্যাটিন অগ্নিদেবতা ভ্যালকানেরও বাহন মোরগ। সব মিলিয়ে প্রাচীনত্বের পাশাপাশি হয়তো ছাগ, মোরগ বা ময়ুর টোটমধারী প্রাচীন জনগোষ্ঠীর দেবতা ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গনেশও আদ্দিকালে ভয়ঙ্কর বিঘ্নসৃষ্টিকারী গজমুন্ডের গণদেবতা। পরবর্তীকালে এই দুই ভয়ঙ্কর দেবতা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে মার্জিত হয়ে দুইভাইয়ে পরিণত। বিঘ্ননাশকের মর্যাদায় ভূষিত।

স্কন্দ মূলত যুদ্ধের দেবতা। শব্দটি এসেছে সংস্কৃত স্কন্ন থেকে। এর অর্থ বীর্য যার আছে সেই বীর্যবান, সাহসী নির্ভীক এবং শক্তিশালী। সুতরাং স্কন্দ যে যুদ্ধদেবতা হবেন তাতে আর সন্দেহ কোথায়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন — 'আমি স্কন্দ ! যুদ্ধের দেবতা।' স্কন্দ থেকে পাঞ্জাবের এক জাঠ সম্প্রদায়ের নাম স্কন্দ। এরা ছিলেন যোদ্ধা জাতি। অতি প্রাচীনকালেই স্কন্দ উপাসকরা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকেই মনে করেন 'স্ক্যান্ডেনেভিয়ান' দেশটি নাকি প্রাচীন স্কন্দ উপাসকদের আদি বাসস্থান। আবার স্কন্দ শব্দের শব্দার্থেই বোঝা যায় তিনি কৃষিদেবতা। অনেক গ্রামে কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিক পুজোর দিনে চাষিরা অঙ্কুরিত বীজের পুজো করেন। কার্তিক চাষের (রবিচাষ) সূচনা করেন। হৈমন্তিক ফসল তোলার নবান্ন উৎসবে কার্তিক পুজো হয় গ্রামবাংলায় সাড়ম্বরে। এইভাবে কার্তিক প্রজননের

শহর কাটোয়া কাঠগোলাপাড়ার ঐতিহ্যবাহী বাবু কার্তিক

দেবতা হয়ে ওঠেন। আজও নবদম্পতি বা বন্ধ্যা রমণীরা সন্তান কামনায় ন্যাংটো শিশুকার্তিকের পুজো করেন। মানত করেন।

এবার চোর কার্তিকের কথায় আসি। বৈদিক যুগে চোর-জোচ্চর-ঠগবাজ-ধাপ্পাবাজদের দেবতা রুদ্র। পৌরাণিক যুগে চোরদের পূজিত দেবতা কার্তিক। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটক, বেতাল পঞ্চবিংশতি থেকে জানা যায় চোরদের 'স্কন্দপুত্র' বলা হত। কথিত আছে চৌর্যকর্মে সফলতা আনার জন্য সিঁদ কাটার নানা প্রযুক্তি নাকি প্রবর্তন করেন কার্তিক। রচনা করে চৌরশাস্ত্র। এর থেকে বোঝা যায় চোর ডাকাতদের পূজিত দেবতা একসময় কার্তিকের মধ্যে মিশে যায় অথবা কার্তিকের জনপ্রিয়তা সমাজের অন্ধকার জগতকেও স্পর্শ করে। কার্তিক যে চোরদের দেবতা ছিল এটা এখনও বোঝা যায় রাতের অন্ধকারে নবদম্পতির বাড়িতে লুকিয়ে মৃৎমূর্তি দিয়ে আসার ঘটনাক্রমে।

প্রস্তর ভাস্কর্যে কার্তিক

দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধের দেবতা হিসেবেই পূজিত। তামিল মুরুগণ শব্দের অর্থ যুবাপুরুষ। সেনথিনের শব্দার্থ স্মার্ট ঝকঝকে তরুণ। আর কন্নড় ভাষায় সুব্রহ্মণীয়ম আসলে সর্পদেবতা। তামিলকাহিনী অনুসারে মরুগণ দুটি বিয়ে করেছিল। উপজাতি কন্যা বল্লী আর ইন্দ্রকন্যা দেবসেনাকে। তামিল Appasi মাসের ষষ্ঠীতিথিতে মুরুগণ পূজিত হন। আর থইমাসের পূর্ণিমায় কার্তিক পুজোপলক্ষ্যে থইপুজাম উৎসবে মেতে ওঠেন তামিলবাসী। দক্ষিণী লোককথানুসারে এইদিন মা পার্বতী অসুর নিধন করার জন্য কার্তিককে বল্লী অর্থাৎ বল্লমটি দান করেছিলেন।

প্রতিমাশিল্পে কার্তিকের প্রথম আত্মপ্রকাশ মুদ্রায়। বিশেষ করে কুষাণসম্রাট হুবিস্কের প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রার গৌণপীঠে স্কন্দকুমারের সমন্বিত রূপ আর বিশাখ দেবতা। কিছু মুদ্রায় আবার স্কন্দকুমার, বিশাখ এবং মহাসেন দেবতার যুদ্ধমূর্তি। হাতে উদ্ধত বর্শা নিয়ে দন্ডায়মান। দু'ধরণের রূপই দেখা যায় যথা একানন ও ষড়ানন। পাঞ্জাব, উত্তর রাজস্থান, হিমাচল প্রভৃতি অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে যৌধেয় নামে পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রদেবতা ছিলেন কার্তিক। তাঁদের প্রচারিত তাম্রমুদ্রা থেকে এমন তথ্য মেলে।

গুপ্তযুগে কার্তিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অন্যতম দেবতা। দু'জন রাজার নামই কার্তিকের নামে। যেমন কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত। গুপ্ত সুবর্ণমুদ্রাতেও কার্তিক মুদ্রিত। অনেকেই মনে করেন হুণ আক্রমণের জন্যই নাকি গুপ্তযুগে ভারতে কার্তিকের জনপ্রিয়তা হটাৎ বেড়ে যায়। মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্র থেকে গুপ্তযুগের একটি কার্তিকের মূর্তিফলক উদ্ধার হওয়ায় কাটোয়া অঞ্চলে তার জনপ্রিয়তা বোঝা যায়। কলহনের রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে পুন্ডবর্ধনে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে প্রায় ঘরে ঘরে কার্তিক পুজো হতো। সেখানকার কার্তিক মন্দিরগুলিতে দেবদাসীরা থাকতেন। যেমন কমলা নামে এক সুন্দরী দেবদাসীকে বিবাহ করেছিলেন কাশ্মীররাজ জয়াপীড়বিনয়াদিত্য। বিবিধ প্রাচীন লেখমালায় রাজ রাজাদের শৌর্য-বীর্য কার্তিকের সঙ্গে উপমিত। গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভের একাদশ শ্লোকে কেদার মিশ্র তপ্তকাঞ্চন বর্ণের গুহের সঙ্গে উপমিত হয়েছেন। সিয়ান শিলালেখের নবম শ্লোকে রাজা নয়পালকে স্কন্দরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

কার্তিকের জন্মবৃত্তান্তে শিব-রুদ্র, অগ্নি-স্বাহা, গঙ্গা,

কৃত্তিকাকুলের প্রসঙ্গ থাকলেও শিব ও পার্বতীই কালক্রমে জনকজননী হয়ে ওঠেন। কার্তিকের একক প্রস্তর ভাস্কর্যের কথা বাদ দিলে আর যে দুটি রূপে দেখা যায় তা হলো মহিষাসুরমর্দিনী এবং পার্বতীর ললিতাবিগ্রহে। প্রথমটি শারদীয়া দুর্গাপুজোয় এবং দ্বিতীয়টি দেখা যায় কেতুগ্রামের বহুলাক্ষীর প্রস্তর ভাস্কর্যে। পাল যুগের এই অনুপম ললিতা বিগ্রহে দেখি মা পার্বতীই তাঁর স্নেহমাখা হাতটি রেখেছেন নগ্ন শিশুকার্তিকের মাথায়।

গাঙ্গেয় জনপদে যেমন কাটোয়া, পূর্বস্থলী, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচড়ো প্রভৃতি স্থানে কার্তিক পুজো জনপ্রিয় লোকউৎসব। এর মূলে নাকি জমিদার, বাবুসম্প্রদায়, কাঁচাপয়সার ব্যবসাদার আর দেহপসারিনী বারাঙ্গানাদের সস্নেহ প্রশয় ছিল। এইসব অঞ্চলের আদি পুজোগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জমিদারবাবুদের গালগল্প। বার বিলাসিনীদের অতৃপ্ত সন্তানবাৎসল্যের ছাঁচভাঙা মিথ।

শহর কাটোয়ার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পুজো ন্যাংটা কার্তিক। উপাসনা করতেন হরিসভাপাড়ার তৎকালীন গণিকারা। এই পুজোকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে কাটোয়ার কার্তিক পুজোর রমরমা। কাটোয়ার কার্তিক পুজোর অন্যতম

শহর কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী ন্যাংটা কার্তিক। গণিকাদের পূজিত এই ঠাকুরকে কেন্দ্র করে শহর কাটোয়ায় কার্তিক পুজোর রমরমা।

থাকা কার্তিক (পালাঃ তারকাসুরের স্বর্গজয়)

বৈশিষ্ট্য 'থাকা পুজো'। বাঁশ দিয়ে তৈরি ক্রমোচ্চমান থাক থাক সিঁড়ির মতো গ্যালারি। কুড়ি থেকে চল্লিশটি পুতুল দিয়ে তৈরি পৌরাণিক দৃশ্যরূপের নাম 'থাকা'। এমন অধিকসংখ্যক বৈচিত্রপূর্ণ থাকা পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও দেখা যায় না। থাকার বিষয় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনি। যেমন — রামের বনবাস, সীতার বিবাহ, কৃষ্ণের জন্ম, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি। একজন কাঠামো শিল্পী, পোশাক শিল্পী ও নির্দেশকের সহায়তায় 'থাকা' মঞ্চস্থ হয়। সবার উপরে থাকেন দেবী জগদ্ধাত্রী অর্থাৎ কাত্যায়নী। তাঁর কোলে শিশুকার্তিক। দু'পাশে পাঁচ থেকে ছ'টি করে নৃত্যরতা সখী। মাঝে সংশ্লিষ্ট কাহিনীর চরিত্রাবলী। প্রাচীন যাত্রাশিল্পের প্রভাব সহজেই লক্ষ করা যায়। আগে শোভাযাত্রার সময়, বাহকেরা বহন করতেন। বর্তমানে যন্ত্রচালিত এক বিশেষ গাড়িতে 'থাকা' ঘোরানো হয়।

কত ধরণের যে কার্তিক পুজো আসে গাঙ্গেয় অঞ্চলে ভাবলে অবাক হতে হয়। বাঁশবেড়িয়ায় যেমন রাজা কার্তিক, ধুমো কার্তিক। কাটোয়ায় তেমনি সাতভাই কার্তিক, সাহেব, জামাই কার্তিক ইত্যাদি। এর ওপর রয়েছে থিমের পুজো। প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা, বাজনা, শোভাযাত্রা আর অসংখ্য দর্শনার্থীর ভীড়ে কার্তিক পুজো হয়ে ওঠে কার্তিক লড়াই।

উৎসবের বেশ

পুজোর শহর কলকাতা

— একটি প্রতিবেদন

বিশাখা দত্ত, Kolkata

এতো বড় সত্যি !!

না ! সত্যি আর হল না । শেষে তীরে এসে ডুবল তরী, প্রায় তিন মাসের বেশী বিজ্ঞাপনে যে দুর্গা চমক লাগাতে চলেছিল তার আর শেষ রক্ষা হল না । ভীড় এবং আইনি জটিলতার কারণেই বন্ধ হয়ে গেল সেই দেশপ্রিয় পার্কের ''বৃহত্তম দুর্গা'' । পুজোর শুরুতে দক্ষিণ কলকাতায় হয়ে গেল বড় রকমের সোরগোল । রাস্তায় যানজট, চারিদিকে উন্মুখ মানুষের-ভীড় সবকিছুকে নীরাশ করে প্রসাশনিক নোটিসে বন্ধ হলো পৃথিবীর ''সর্ব বৃহত্তম'' দুর্গা দর্শন ।

তবুও মানুষের নজর কেড়েছে আরও অনেক দুর্গা পুজোর অভিনবত্ব । বাগবাজার তার সাবেকীয়ানা বেশ বজায় রেখেছে । আবার চালতা বাগানে চালতা নয়, নারকেলের ছোবড়ার মন্ডপ সকলকেই তাক লাগিয়েছে ।

''মা'কি তোদের একার'' — না মা মোটেই আমাদের একার নয় । মা সবার সেটাই প্রমাণ হল সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের 'স্পেস সিপ' দেখে । মা জগজ্জননী । মা এসেছেন UFO চড়ে । আবার কোথাও মা হলেন খুকি । যেন সবে অ, আ, ক, খ শিখেছেন । মজা নয়, সত্যি ! এমন ভাবনা দেখলাম দমদম পার্কের তরুণ সঙ্ঘে ।

এছাড়া মন্ডপে চমক দিল টালা বারোয়ারী । সত্যজিৎ-এর স্মরণে হীরক রাজার দেশ, যন্তর মন্তর ঘর, আবার অন্য পাশে হাসজারুর সাপেক্ষে হাইব্রিড প্যান্ডেল ।

উৎসবের আগে উৎসবের দিনগুলিতে আমাদের কেমন দেখতে লাগবে তার প্রস্তুতি শুরু হয় বহু পূর্বে । 'পুজোর রেশ' বলতে গেলে সর্বপ্রথম যা মনে আসে তা হল পোশাক — পুজোর দিনগুলিতে কীভাবে হয়ে উঠব অনন্যা, কেড়ে নেব সকলের নজর । আর তাই কলকাতার প্রায় সমস্ত দোকানে দোকানে নানান সম্ভার । পার্কস্ট্রিটের সভেরা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডিজাইনিং হাউস । সাবেকী বাংলার তাঁতও সেজেছে নতুন সাজে । পুজো মানেই ফ্যাশান নিয়ে নানান পরীক্ষা । পুজোর আগেই কিন্তু চালু হল কেয়া শেঠের শপিং মল, যেখানে সাবেকিয়ানা ও আধুনিকতার চমৎকার মেলবন্ধন ঘটেছে । ছোট থেকে বড় সকলের চোখ ধাঁধানো পোশাক অবশ্যই মিলবে । আর বলা বাহুল্য মানানসই গয়না তো আছেই ।

শুধু জামাকাপড় নয় পুজোর কদিন তো খেতেও হয় পেট পুরে । এই চার দিন বাড়ির মেয়েদের একদম বিশ্রাম । তাহলে উপায় ? উপায় একটাই — হোটেল । কলকাতার প্রায় সব রেস্তোরা তাদের পুজোর সাজে নানান খাবারে সম্ভার সাজিয়ে ছিল । এর সাথে পুজোর কদিন পাওয়া যায় অনবদ্য ভোগ যা সারা বছর সচারাচর পাওয়া যায় না । বাড়ির পুজো হলে আছে হরেকরকম মিষ্টি, বাড়ির মা-কাকিমাদের হাতে বানানো নাড়ু আর বিকেলে আড্ডার মাঝে নানান মুখোরোচক খাবার । যারা একটু মিষ্টি ভালবাসেন তাদের জন্য নকুড়, বলরাম সুইটস-এর মতো নামকরা দোকানে অভিনব স্বাদ ও মিষ্টির পসরা এবারেও ছিল । চিরাচরিত সন্দেশ-রসগোল্লার সাথে নানারকম বেকড মিষ্টি সবই খুব লোভনীয় ।

পুজোর নতুন গানের জগতে দেখা গেল সব অ্যালবামই পুজোর সদ্য আগে মুক্তি পাওয়া সিনেমা গুলোর গান । অ্যালবাম উদ্যোক্তারাও স্বীকার করেছেন যে বর্তমানে আলাদা করে পুজোর অ্যালবামের সংখ্যা যথেষ্টই সীমিত । স্বরচিত গান কমে গিয়ে এখন কেবল রবীন্দ্রসঙ্গীতের পসরাই পুজোর গান । এছাড়া রয়েছে কিছু ব্যান্ডের গান তবে আপাতদৃষ্টিতে পুজো প্যান্ডেলে বা পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও জনপ্রিয় হচ্ছে কেবলই সিনেমার গান ।

পুজোয় বই মানে হরেকরকম পুজো সংখ্যা। এবারে বেশ কয়েকটি পুজো সংখ্যা নজর কেড়েছে যেমন আজকাল ও এইসময়। এছাড়া দেশ, সানন্দা ইত্যাদি তো আছেই। লেখা কমিয়েছেন সমরেশ মজুমদার, ছোটগল্প বেশী জনপ্রিয়তা পেয়েছে পুজো সংখ্যায়।

এবারের পুজোয় দুটি বাংলা ছবি সকলের মন ভরেছে একটি সৃজিত মুখার্জীর 'রাজকাহিনী' অন্যটি অঞ্জন দত্তের 'ব্যোমকেশ বকসী'।

সাদাত হোসেন মান্টোর 'খোল দো' দ্বারা অনুপ্রাণিত বাংলা ছবি 'রাজকাহিনী'। যদিও পরের অংশে দেশভাগ, ভিটে রক্ষার তাগিদ, আন্দোলন দেখা গেছে। শেষের দুটি চমক হল রানী পদ্মিনীর জহরব্রত অনুকরণ এবং জাতীয় সঙ্গীতের অপ্রকাশিত অংশ যেটা ছবির মূল চমক। চমৎকার অভিনয় দেখা গেছে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর বেগম জান-এর চরিত্রে। সাহসী চরিত্রে পার্ণো, সুদীপ্তা, প্রিয়াঙ্কা সকলকেই। চমকপ্রদ ভূমিকায় দেখা গেছে যীশু সেনগুপ্তকে। আর সবচেয়ে বড় চমক হল মহেশ ভাট ও ভেঙ্কটেশ ফিল্মের সহ প্রযোজনায় 'রাজকাহিনী' তৈরী হতে চলেছে হিন্দিতে। পরিচালনা করবেন স্বয়ং সৃজিত, নাম হবে 'লাকীর' — সম্ভবত পশ্চিম পাকিস্থান ভাগ নিয়ে হবে কাহিনী। মুখ্য চরিত্রে হয়তো বিদ্যা বালানকে দেখা যেতে পারে। এছাড়া ঋতুপর্ণার অভিনয়ে মুগ্ধ মহেশ ভাট প্রায় ঠিক করেই ফেলেছেন যে একটি চরিত্রে ঋতুপর্ণা থাকবেই। আলিয়া ভাট-এর নামও শোনা যাচ্ছে। হিন্দিতে চিত্রনাট্য লিখছেন শ্রীজাত। ২০১৬-র শুরুতেই সম্ভবত শুরু হবে শুটিং।

যীশু সেনগুপ্তর প্রায় একদম বিপরীত চরিত্রে এসেছেন ব্যোমকেশ বক্সী হিসাবে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''কহেন কবি কালিদাস'' অবলম্বনে করা ব্যোমকেশ বক্সীও — আট থেকে আশি সবার কাছে সমান ভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। অঞ্জন দত্তর স্বয়ংক্রিয়তা মূল গল্পের সাথে এই ছবির অনেকাংশে পার্থক্য করে দিয়েছে, যেমন ছবিতে ব্যোমকেশ বেশ উদার মনস্ক। দোষীদের শাস্তি না দিয়েও পালাবার পথ বাতলে দেন তিনি। এছাড়া অজিতের ভূমিকায় শাশ্বতর উপস্থিতি ছবিকে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। ব্যোমকেশ শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হবার পর বেশ কয়েকটি দৃশ্যে আমরা ''সহকারী গোয়েন্দা অজিত'' কে দেখতে পাই। তবে বর্তমান কালের সাপেক্ষে কিছু নাটকীয়তা, পরকীয়তা, সাহসী অভিনয় লক্ষ্য করা যায়। আর এই ছবির সবচেয়ে বড় চমক আগামী ছবি 'চিড়িয়াখানার' সূত্র দিয়ে যাওয়া। বাঙালীর পুজোর আড্ডার চর্চা যে এই দুই সিনেমা দখল করে রেখেছে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

তৃতীয় পুজো রিলিজ রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত 'কাটমুন্ডু' দেখলে হয়তো ধ্বংসপূর্বের নেপালের কথা মনে পড়বে। গতানুগতিক নয়, একটু ভিন্ন স্বাদের ছবি যাতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন রুদ্রনীল সেনগুপ্ত। হয়তো এটাই নেপালের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। এই নেপালকে আবার নবরূপে দেখতে হলে হয়তো অপেক্ষা আরো পঞ্চাশ বছর।

'পুজোর রেশ' কখনো শেষ হয় না, কারণ পুজো শেষ হলেই আমরা আগামী বছরের পুজোর পরিকল্পনা করতে থাকি। দীপাবলী, ভাইফোঁটা, মা লক্ষীর আগমন আর নতুন বছরের মা সরস্বতীর আরাধনা আমাদের রেশ থেকে বেরোতেই দেয় না। উৎসবের আমেজ থেকেই যায়। এই আমেজ নিয়েই আমরা অপেক্ষা করি আগামী বছর কবে 'মা দুগ্গা' আসবেন।

INTRODUCTION

Rainer Maria Rilke, widely recognized as one of the most lyrically intense German language poets, was born on December 4, 1875 in Prague. As a lyricist, his most remarkable contribution was in the areas of diction and imagery. He expressed his ideas with physical symbols rather than abstract imagery. The Book Of Hours, New Poems, Duino Elegies, Sonnets To Orpheus are some of his remarkable works. The unique poetic philosophy expressed in Duino Elegies is considered significant to many literary scholars. His only prose work is a loosely autobiographical novel based on the life of a student. It is called The Notebook Of Malte Laurids. The following quote from his Letters To A Young Poet will help to throw some light on his classic poetic idea of poetry as an expression of one's inner life which moved the readers from all over the world for ages. "Why do you want to shut out of your life any uneasiness, any misery, any depression, since after all you don't know what work these conditions are doing inside you?.. .If there is anything unhealthy in your reactions, just bear in mind that sickness is the means by which an organism frees itself from what is alien;so one must simply help it to be sick, to have its whole sickness and to break out with it,since that is the way it gets better.”

Ranjita Chattopadhyay

Das Lied des Idioten

Rainer Maria Rilke

Sie hindern mich nicht. Sie lassen mich gehn.
Sie sagen, es könne nichts geschehn.
Wie gut.
Es kann nichts geschehn. Alles kommt und kreist
immerfort um den heiligen Geist,
um den gewissen Geist (du weißt) -,
wie gut.

Nein, man muß wirklich nicht meinen, es sei
irgend eine Gefahr dabei.
Da ist freilich das Blut.
Das Blut ist das Schwerste. Das Blut ist schwer.
Manchmal glaub ich, ich kann nicht mehr -.
(Wie gut.)

Ah, was ist das für ein schöner Ball;
rot und rund wie ein Überall.
Gut, daß ihr ihn erschuft.
Ob der wohl kommt, wenn man ruft?

Wie sich das alles seltsam benimmt,
ineinandertreibt, auseinanderschwimmt:
freundlich, ein wenig unbestimmt.
Wie gut.

The idiot's song

Rainer Maria Rilke
Translation: Dhiman Chakraborty, Chicago

They don't bother me. They let me be.
They say, "Nothing's going to happen".
Oh, well.
Nothing can happen.
Things just roll in and keep rolling
and trudging in an endless monotone toward the Holy Ghost.
Always toward the same Ghost (you know).
Oh, well.

There's no reason to think that it's dangerous as such.
But then there's blood.
Blood is difficult. It is indeed the most difficult of all problems.
And that pushes me to the end of my wits.
Sometimes I feel like I can take it no more.
(Oh, well.)

Ah, how is that for a splendid ball -
round and red all over?
They created it. That's nice.
But will it come when they call?

Things behave in strange ways –
now rushing into each other, now drifting idly apart -
in an amiable manner, but somewhat lacking in purpose.
Oh, well.

পাগলের গান

Rainer Maria Rilke
বঙ্গানুবাদ : ধীমান চক্রবর্তী, Chicago

ওরা খুব একটা মাথা ঘামায় না আমায় নিয়ে ।
আমাকে থাকতে দেয় নিজের মতো ।
বলে, ‘‘কিছু হবে না’’ ।
তা ঠিক ।

কিছুই হয় না ।
সবই গড়িয়ে ঢোকে,
তারপর ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, অনুভব, নতুনত্বের লেশ নেই,
ভূতে-পাওয়ার মতো ক্লান্তিহীনভাবে গড়াতে থাকে পরমাত্মার দিকে
সব সময় সেই একই আত্মার দিকে । (এ আর কে না জানে ?)
তা মন্দ কি ?

অবশ্য, তাই বলে ‘‘অবস্থা বিপজ্জনক’’ এমন মনে করার কোন কারণ নেই ।
তবু, রক্ত রয়ে যায় ।
রক্ত জিনিসটা সহজ নয় । সব প্রশ্নের মধ্যে রক্তের প্রশ্নটাই সবচেয়ে মারাত্মক ।
ভেবে আমি কোন কূল-কিনারা পাই না ।
থেকে থেকে অসহ্য লাগে ।
(তা লাগুক) ।

কি চমৎকার ঐ গোল খেলনাটা ! কেমন নিখুঁত, নিটোল আর লাল !
এমন সুন্দর জিনিস কেউ দেখেছে কখনও ?
ওটা ওদের সৃষ্টি । অপূর্ব ।
কিন্তু, প্রয়োজনে স্রষ্টাদের ডাকে ওটা সাড়া দেবে তো ?

সবকিছুরই মতিগতি বড় অদ্ভুত —
এই হুড়মুড়িয়ে তেড়ে আসছে এ ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে গোঁয়ারের মতো,
আবার এই অলসভাবে দুলতে দুলতে ভেসে যাচ্ছে পরস্পরের থেকে দূরে
মোটের ওপর বন্ধুত্বভাবাপন্ন বলা চলে, তবে কেমন যেন অনিশ্চিত ।
তা কি আর করা যাবে ?

ফুটবল

আলপনা গুহ, Perth, Australia

Le Petit Nicolas - এক অতি জনপ্রিয় ফরাসি শিশু সাহিত্য সিরিজ। René Goscinny এর স্রষ্টা, ছবি এঁকেছেন Jean-Jacques Sempé, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯ সালে। পঞ্চাশের দশকের ফ্রান্সের শিশুদের শৈশবের ছবি ফুটে উঠেছে এই সিরিজের গল্পগুলিতে।

সেদিন বিকেলবেলা বোধিসত্ত্ব আমাদের অর্থাৎ ক্লাসের কয়েকজন বন্ধুকে ওর বাড়ীর কাছে একটা মাঠে আসতে বলেছে। বোধিসত্ত্ব আমার বন্ধু বেজায় মোটা, খেতে খুব ভালবাসে। বোধিসত্ত্ব আমাদের ডেকেছে কারণ ওর বাবা ওকে একটা নয় নম্বর ফুটবল কিনে দিয়েছে। সেই উপলক্ষে আমরা একটু আনন্দ করবো। বোধিসত্ত্বটা কি ভালো!

বিকেল তিনটের সময় মাঠে গিয়ে হাজির হলাম। আমরা রয়েছি আঠারোজন। এবার খেলার টিম ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক টিমে সমান খেলোয়ার চাই। রেফারি বাছাই সোজা কাজ। আমরা অয়নকে ঠিক করলাম। অয়ন আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, আমরা ওকে ঠিক পছন্দ করি না। কিন্তু ও চশমা পরে বলে ওর মাথায় গাঁট্টাও মারতে পারি না। রেফারি হওয়ার জন্য অয়নই উপযুক্ত। তাছাড়া কোনো দলই ওকে চাইবে না। কারণ ফুটবল খেলার পক্ষে ও বড্ড দুবলা পাতলা, কথায় কথায় কেঁদে ফেলে। কিন্তু অয়ন যখন বাঁশি চেয়ে বসলো তখনি হলো মুশকিল। আমাদের মধ্যে একমাত্র রূপকেরই বাঁশি আছে। কারণ ওর বাবা পুলিশ।

রূপক বললো, ‘‘আমি বাঁশি ধার দিতে পারবো না। এটা আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি।’’ রূপক কিছুতেই রাজি নয়। বাঁশি কাছছাড়া করতে। শেষে ঠিক হল বাঁশি বাজানোর দরকার হলে অয়ন রূপককে বলবে তখন রূপক অয়নের হয়ে বাঁশি বাজাবে।

‘এবার আমরা খেলবো না কি করবো? আমার খিদে পেয়ে গেছে।’ চেঁচায় বোধিসত্ত্ব। কিন্তু ব্যাপারটা এবার জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আঠারো জনের মধ্যে অয়ন রেফারি হওয়াতে খেলোয়াড়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সতেরো। সংখ্যাটা সমান ভাগের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। যা হোক শেষ পর্যন্ত আমরা একটা উপায় খুঁজে পেলাম। খেলায় লাইনসম্যান থাকে, যে মাঠের বল বেরিয়ে গেলেই একটা ছোট্ট পতাকা নাড়ে। একাজের জন্য মৈনাককে বাছাই করা হলো। একজন লাইনসম্যানের পক্ষে সারা মাঠটার ওপর রাখা খুব মুশকিল। কিন্তু মৈনাক খুব জোরে দৌড়াতে পারে। খ্যাংড়া কাঠির মতো সরু লম্বা পা আর ঢিবির মতো মালাইচাকি। মৈনাকের কোনো কিছু শেখার আগ্রহ নেই, ও শুধু বল পেটাতে ভালবাসে।

মৈনাক ফার্স্ট হাফের জন্য লাইনসম্যান হতে রাজি হোলো। কিন্তু ওর কাছে তো পতাকা নেই, জানালো মৈনাক। তাই পতাকার জন্য ওর বিচ্ছিরি নোংরা রুমালটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ও তো আর বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় জানতো না ওর রুমালটা দিয়ে পতাকার কাজ চালাতে হবে। তাহলে না হয় পরিষ্কার রুমাল নিয়ে আসতো।

‘‘তাহলে খেলা শুরু?’’ চেঁচায় বোধিসত্ত্ব।

এরপর তো টিম ভাগের কাজটা সহজ। আমরা রয়েছি ষোলো জন। প্রত্যেক ফুটবল দলে একজন করে ক্যাপটেন থাকে। কিন্তু মুশকিল হলো আমাদের টিমে সবাই ক্যাপটেন হতে চায়। সবাই, শুধু বোধিসত্ত্ব বাদে। বোধিসত্ত্ব গোলে দাঁড়াতে চায় কারণ ও দৌড়াদৌড়ি একদম পছন্দ করে না। বোধিসত্ত্ব বেশ বড়োসড়ো চেহারার, গোলের অনেকটাই ওর শরীরে ঢেকে যায়। ওকে বাদ দিয়ে বাকি থেকে যায় পনেরো

জন ক্যাপটেন। দরকারের চেয়ে অনেক বেশি। ‘‘আমার গায়ে সবচেয়ে বেশি জোর’’। চেঁচায় পার্থ, ‘‘আমি ক্যাপটেন হবো। আর যে আমাকে মানবে না তার নাকে মারব এক ঘুঁষি’’। আমি টস করার আইডিয়া দিলাম টস করতে গিয়ে আমাদের দুটো পয়সা লাগলো। কারণ প্রথমবার পয়সাটা ঝোপের মধ্যের পড়ে হারিয়ে গেলো। আর খুঁজেই পাওয়া গেলো না। জয়দীপের কাছ থেকে পয়সাটা ধার নেওয়া হয়েছিল, পয়সা হারানোয় জয়দীপ মোটেও খুশি নয়। ও খালি পয়সাটা খুঁজতেই লাগল। শেষে রাজা কথা দিল ওর বাবাকে বলবে একটা চেক লিখে দিতে। শেষমেশ দুজন ক্যাপটেন ঠিক হলো। রাজা আর আমি। ‘শোন, বড্ডো খিদে পেয়েছে’। চেঁচায় বোধিসত্ত্ব, ‘তোরা কি খেলবি’?

যা হোক দল তৈরী শেষ হোলো। সবাই খুশি। খালি পার্থ ছাড়া। আমি আর রাজা দুজনেই পার্থকে দলে চাই কারণ ও যখন বল নিয়ে দৌড়ায়, কেউ ওকে আটকাতে পারে না। পার্থ যে খুব ভাল খেলে তা নয়। কিন্তু সবাই ওকে ভয় পায়। এদিকে জয়দীপ ওর আগের পয়সাটা খুঁজে পেয়েছে, তাই খুব ফূর্তি। আমরা আবার জয়দীপের কাছে পয়সাটা ধার চাইলাম, পার্থ কার টিমে যাবে টস করে ঠিক করার জন্য। আমাদের দ্বিতীয় পয়সাটা আবার এর মধ্যেই হারিয়ে গেলো। জয়দীপ ফের পয়সাটা খুঁজতে লেগে গেলো — এবার ও সত্যি সত্যি খুব রেগে গেছে। এবার টসে রাজা জিতলো, ওর টিমে পার্থ। রাজা পার্থকে গোলে দাঁড় করালো। কারণ ওর মতে তাহলে কেউ আর গোলের কাছে ঘেঁষতে সাহস করবে না, ফলে গোলে বলও ঢুকবে না। পার্থ কিন্তু মোটেও খুশি হলো না। এদিকে পাথর দিয়ে মার্কা করা গোলের ভিতর দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্ব বিস্কুট চিবুচ্ছে, হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছে বেশ রেগে আছে। ‘‘কি রে তোরা খেলবি ?’’ আবার চেঁচায় বোধিসত্ত্ব।

আমরা মাঠে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। গোলকিপার বাদ দিলে প্রত্যেক টিমে সাত জন করে খেলোয়াড় নেই। তাই পজিশান ঠিক করা মোটেও সহজ কাজ নয়। কেউই সেন্টার ফরওয়ার্ড হতে রাজি নয়। জয়দীপ রাইট ব্যাকে দাঁড়াতে চায়। কারণ মাঠের ঐ কোনায় ওর পয়সাটা পড়ে গেছে। খেলতে খেলতে ও পয়সাটা খুঁজতে চায়। রাজার টিমে তাড়াতাড়ি পজিশান ঠিক হয়ে গেলো কারণ পার্থ সবার নাকে এক ঘা করে ঘুঁষি মারছিল। পার্থর ঘুঁষি খেয়ে ফোলা নাক নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। পার্থর ঘুঁষির জোর আছে বটে। আমার টিমে কিছুতেই ঝগড়াঝাঁটি মিটছে না দেখে পার্থ শেষপর্যন্ত খেলোয়াড়দের নাকে এক ঘা করে ঘুঁষি বসানোর ভয় দেখালো। অমনি সব সুড়সুড় করে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

অয়ন রূপককে বললো, ‘‘বাঁশি বাজা’’। অমনি রূপক খেলা শুরুর বাঁশি বাজিয়ে দিল।

রাজা মোটেও খুশি নয়। ও বললো, ‘‘এটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না। আমাদের চোখে রোদ পড়ছে। আমরা কেন মাঠের বাজে দিকে খেলবো ?’’ আমি উত্তরে বললাম, সূর্য তো আর আমাদের খেয়াল খুশি মতো চলবে না। বরং ওরা যদি চোখ বন্ধ করে খেলে তাহলে ভাল খেলবে। ব্যস, লেগে গেলো হাতাহাতি। রূপক জোরে বাঁশি বাজিয়ে দিল।

‘‘আমি তোকে বাঁশি বাজাতে বলি নি’’ চেঁচিয়ে ওঠে অয়ন, ‘‘রেফারি তো আমি’’। তাতে রূপকের কিছু এসে যায় না। রূপক বললো, বাঁশি বাজানোর জন্য অয়নের পারমিশানের দরকার নেই। ওর যখন খুশি তখন বাঁশি বাজাবে। এই না বলে পাগলের মতো এক নাগাড়ে বাঁশি বাজিয়ে যেতে লাগলো। ‘‘তুই একটা পাক্কা শয়তান’’ এই বলে অয়ন কাঁদতে শুরু করে।

‘‘এই যে ছেলেরা’’ গোলে দাঁড়িয়ে চেঁচায় বোধিসত্ত্ব। কিন্তু কেউ ওর কথা শোনে না। আমি রাজার সাথে মারামারি চালিয়ে যেতে থাকি। আমি ইতিমধ্যে খামচা মেরে ওর নীল রঙের বাহারে জার্সি ছিঁড়ে ফেলেছি। ‘বয়েই গেছে, কিসসু হবে না। আমার বাবা এরকম আর একটা কিনে দেবে’। এই না বলে রাজা আমার গোড়ালিতে এক লেঙ্গি মারে। রূপক অয়নের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। আর অয়ন চেঁচাতে থাকে, ‘আমার চশমা, আমার চশমা’। এদিকে জয়দীপ এসব গন্ডগোলের মধ্যে মাথা না ঘামিয়ে এক মনে ওর পয়সাটা খুঁজে যাচ্ছে।

বেচারা পয়সাটা এখনো খুঁজে পায় নি।

পার্থ চুপচাপ গোলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে ওর গোলের কাছাকাছি আসছে তার নাকেই গদাম করে এক ঘুঁষি বসাচ্ছে। মানে ঘুঁষি খাচ্ছে ওর নিজের টিমের খেলুড়েরাই। সবাই মিলে চিৎকার করছি, দৌড়োচ্ছি-দারুন মজা !

এর মধ্যে বোধিসত্ত্ব চেঁচিয়ে ওঠে, 'এবার থাম তোরা সবাই' পার্থ রেগে গিয়ে বলে, 'তুই তখন থেকে খালি কখন খেলবি, কখন খেলবি করছিস। আরে বাবা আমরা তো খেলছিই। তোর কিছু বলার থাকলে হাফ টাইমের পর বলবি।'

'কিসের হাফ টাইম ?' বলে ওঠে বোধিসত্ত্ব, 'আমাদের তো ফুটবলই নেই। বলটা তো ভুল করে বাড়িতে ফেলে এসেছি'।

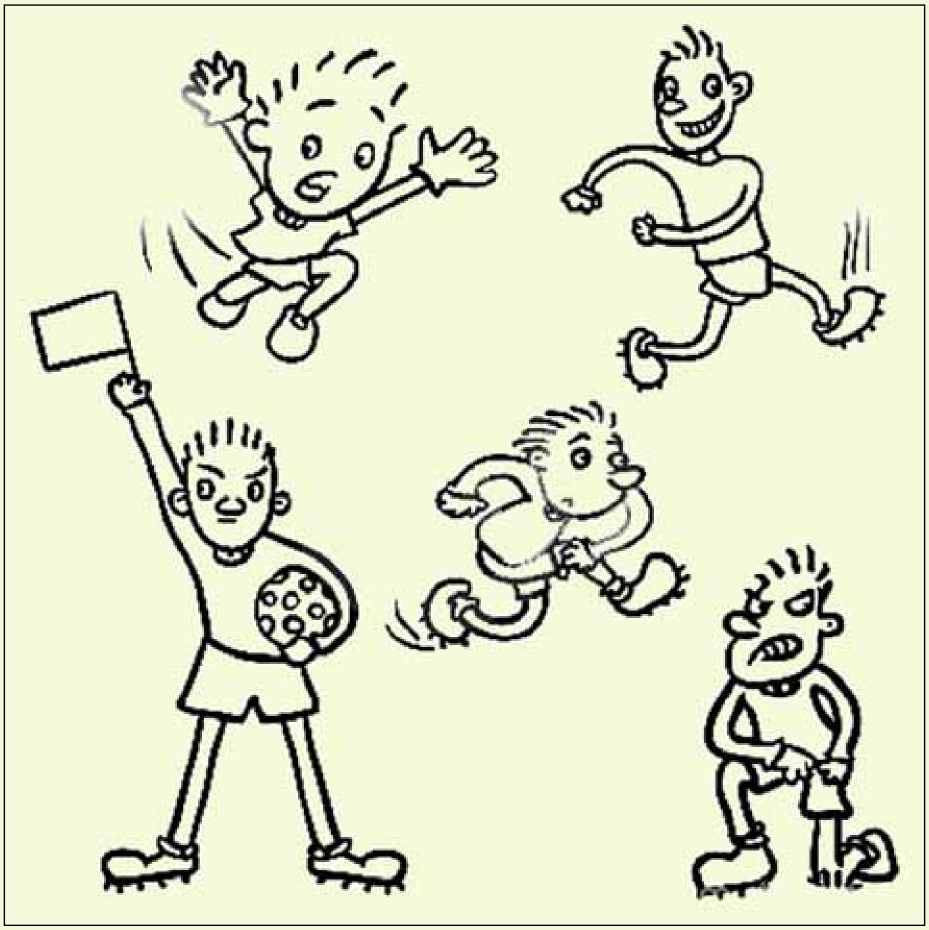

দিল্লির Alliance Francaise থেকে ফরাসি ভাষায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত আলপনা গুহ এই সিরিজের অনেক গুলি গল্প মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে পার্থের বাসিন্দা, এখানে তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুবাদকের কাজ করছেন।

পাখী

সুজয় দত্ত, Ohio, USA

পাশের বাড়ীর ড্রাইভওয়েতে যে দুধসাদা মিনিভ্যানটা সারাদিন দাঁড়িয়েছিল, পড়ন্ত বিকেলে সেটাকে চলে যেতে দেখেই দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল মা। ডাইনিং টেবিলের ওপর একগাদা কাগজ আর রংপেন্সিল ছড়িয়ে হিজিবিজি ছবি আঁকছিল ছ-বছরের টুকাই, মায়ের পিছুপিছু সেও গেল তার মিকিমাউস হাওয়াই চটিটা পায়ে গলিয়ে। প্রতিবেশী মিসেস উইলসন তখনও গলিরাস্তার মোড়ের স্টপ্‌সাইনে দাঁড়ানো মিনিভ্যানটার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছিলেন সেটা বড়রাস্তায় বাঁক নিতে পায়ে পায়ে বাড়ীমুখো হলেন। মার দিকে চোখ পড়তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওয়েল, দ্য নেস্ট ইজ নাও এম্প্‌টি'। আর তিন সপ্তাহ বাদে সেপ্টেম্বার পড়লেই কিন্ডারগার্টেন ছেড়ে গ্রেড স্কুলে যাবে টুকাই, 'এম্পটি' আর 'নেস্ট' মানে সে জানে কিন্তু উইলসনরা পাখী পোষে, এটা তো জানা ছিলনা। ওদের যমজ ছেলেমেয়ে — স্টার্লিং আর রবিন টুকাইয়ের চেয়ে অনেক বড়, তাই তার খেলার সাথী না হলেও দুজনেই ওকে ভালবাসে। স্টার্লিং বাস্কেটবলের পোকা, বাড়ীর সামনে বাস্কেটবলের হুপ্ টাঙিয়ে রোজ বিকেলে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে যখন খেলে, তখন টুকাই গিয়ে দাঁড়ালে ওর হাতে বল ধরিয়ে দেয় একটা ট্র্যাশক্যান্‌কে বাস্কেটের মতো করে ধরে বলে, 'কাম অন্ ম্যান, স্কোর আ থ্রি-পয়েন্টার'। নিজের বাইকের ক্যারিয়ারে বসিয়ে ওকে বাড়ীর সামনের রাস্তায় বাঁইবাঁই ঘোরায়। আর রবিন তো সকাল-বিকেল ওর ইয়া বড়বড় লোম-ওয়ালা হাভানিজ্ কুকুর 'স্টকি'কে নিয়ে হাঁটতে বেরোলেই একবার ওদের বাড়ী ঢুঁ-মেরে যায়। টুকাই তখন আশ মিটিয়ে চটকায় স্টকিকে, লোম ধরে টানে। কিন্তু কুকুরটা ওকে একদম ছোট থেকে দেখছে বলে কিচ্ছু বলেনা। সব সহ্য করে। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে টুকাইকে ওদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে পাশে বসিয়ে ওর আব্দারমতো ছবি এঁকে দেয় রবিন। খুব ভাল আঁকার হাত মেয়েটার। কারো কাছে শেখেনি কখনো, কিন্তু কী সুন্দর আঁকে। বিগ্ বার্ড, উইনি দ্য পুঃ, টমাস দ্য ট্যাঙ্ক এঞ্জিন, পিটার র‍্যাবিট — রবিনের ছবিতে ছবিতে ভর্তি টুকাইয়ের শোবার ঘর। কিন্তু আজ কী ব্যাপার, কেউ তো খেলছে না বাস্কেটবল? স্টকিকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবারও নাম নেই। মা বলল, 'ফিল্ ফ্রী টু কাম টু আস, হোয়েনেভার ইউ আর লোন্‌লি।'

'আই উইল, ডিয়ার। থ্যাংক্‌স্ এ লট' বলতে বলতে স্প্রিংডোর ঠেলে বাড়ীর ভেতর মিলিয়ে যান মিসেস উইলসন।

'মাম্মি, কী পাখী ছিল ওদের ? বলনা। আমার এবারের বার্থ্‌ডেতে ওই পাখীটা কিনে দেবে ?' কিন্ডারগার্টেনে সবকিছু ইংরেজীতে হলেও বাড়ীতে মা-বাবার সঙ্গে বাংলাই বেশী বলে টুকাই। আধো আধো বাংলায় ওর মুখে বায়না-আব্দার-অভিযোগ শুনতে বড় মিষ্টি লাগে। মা ওর চুলে বিলি কেটে আদর করে বলল, 'দেব সোনা, তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকলেই এই বারো বছর তুমি যা যা চাইবে, সব দেব। তারপর তো তুইও —'

বারো মানে তো টুয়েল্‌ভ্। টুকাই এখন সিক্স। কিন্ডারগার্টেনে শুধু এক-দুই শেখায়নি, যোগ করতেও শিখিয়েছে একটু আধটু। মিস জেনিফার ওর প্রিয় টীচার, কী সুন্দর কার্টুন দেখিয়ে আর গান শুনিয়ে অঙ্ক শেখান। ওয়ান লিট্‌ল্ বাটারফ্লাই হ্যাপি অ্যান্ড ফ্রী, টু কাম অ্যান্ড জয়েন ইট — দ্যাট মেক্‌স্ থ্রি। তার খুদে হাতের ছোট্ট ছোট্ট আঙুলের কর গুনে গুনে টুয়েল্‌ভ্ প্লাস সিক্স বার করার চেষ্টা করে টুকাই। সেভেন্টিন, না না, এইটটিন। কী হবে তার এইটটিন হলে ? বলতে গিয়ে থেমে গেল মা, তাই জানা হলনা। জিজ্ঞেস করতে যাবে, এমনসময় দরজায় টুংটাং। বাবা এসেছে ! রোজকার মতো দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলে ও, খুলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবার কোলে। পায়ের জুতোমোজাটা কোনোরকমে খুলে হাতের ব্রিফকেস্‌টা সোফায় ছুঁড়ে দিয়েই ওকে নিয়ে খেলতে বসে যায় বাবা। চলতে থাকে প্রশ্নোত্তরের পালা। আজ অফিসে টীচার কী বলেছে, সবাই ঠিক সময় লাঞ্চ খেয়ে ন্যাপ নিয়েছিল কিনা, বাবা দুষ্টুমি করলে টাইম

আউট দিয়েছিল কিনা, বিকেলবেলা প্লে-টাইমের পর কোন্ মুভিটা দেখিয়েছে — বার্নি দ্য ডাইনোসর না সেসেমি স্ট্রিট, ইত্যাদি। এ ওদের প্রতিদিনের রুটিন। মা চা-জলখাবার দিতে এসে বলল, 'জানো, আজ পাশের বাড়ীর ওরা কলেজ চলে গেল'।

'আজ ? এত তাড়াতাড়ি? ক্লাস শুরু হবে তো সেই লেবার ডে-র পর।'

'কী সব ওরিয়েন্টেশন-ফেশন আছে বলছিল।'

'কোথায় গেল ? রিচ্‌মন্ড না রোনক ?'

'না না, ব্ল্যাক্‌স্‌বার্গ না কী যেন — অনেকটা ড্রাইভ এখান থেকে।'

'ও, ভার্জিনিয়া টেক্। ভাল জায়গা। কি টুকুবাবু, তুমিও যাবে নাকি ভার্জিনিয়া টেক ? চলো, আর এলিমেন্টারি স্কুল মিড্‌ল্ স্কুলে যেতে হবেনা, তোমাকে একেবারে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিয়ে আসি।'

'সেটা কী ?' কৌতূহলী হয় টুকাই।

'আরো অ-নে-ক বড় একটা স্কুল। অনেক টীচার, বিরাট খেলার মাঠ।'

'ওখানে লাঞ্চে চিকেন নাগেট আর কাপ্‌কেক্ দেয় ? গুড্‌বয় হয়ে থাকলে স্টিকার দেয় ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। আরো কত কী দেয়।'

'থালে আমি যাব। মাম্মি, তুমিও যাবে।'

মা মুখ টিপে হেসে বলল, 'ওখানে কিন্তু এই মোটা মোটা সব বই পড়তে হয়, খুব শক্ত শক্ত অঙ্ক করতে দেয়, না পারলে ইস্কুল ছুটির পর আটকে রাখে।'

'নন্‌না, থালে যাবনা। আমি তোমার অফিস ইস্কুলে যাব।' বাবার ঘাড়ে উঠে আব্দার করে টুকাই, 'বাবা, আমায় একটা পাখী কিনে দাও না।'

'কী পাখী, ঈগল না অস্ট্রিচ ?'

'দূর ! রবিন্‌দের যে পাখীটা ছিল। আই উইল আস্ক রবিন্ ইট্‌স্ নেম টুমরো। জানো তো, আন্টি বলছিল ওদের পাখীটা আজ উড়ে গেছে।'

'রবিন্ আর কাল থেকে আসবে না সোনা', বাবার কোল থেকে তুলে নিয়ে ওকে ডাইনিং টেবিলে বসাতে বসাতে বলল মা। এখন স্ন্যাক্‌টাইম।

'কেন ? কী হয়েছে ওর ?'

'ঐ যে বললাম, ও সেই বিরাট বড় ইস্কুলটায় গেছে। ওখানে অঙ্ক না পারলে আটকে রাখে তো ! ও পারেনি। তাই আটকে রেখে দিয়েছে।'

'হোয়াট অ্যাবাউট স্টার্লিং ? হি ইজ্ স্ট্রং। হি ক্যান্ ফাইট। হোয়াই ডাজ্‌ন্ট হি গো অ্যান্ড গেট হিজ্ সিস্টার ?'

'ও গেছে তো ফাইট করতে', বাবা গম্ভীরমুখে বলে, 'কিন্তু ওখানে এত বড় বড় মন্‌স্টার, ডেমন্ আর ওগ্‌র্ আছে, তাদের সঙ্গে ও কখনো পারে ? দেখবি, ওকেও ওরা আটকে রাখবে।'

'অ্যাই, ওকে ভয় দেখাচ্ছ কেন ? বাবাটা না বড় পাজি। না রে বাবু, মন্‌স্টার-ফন্‌স্টার নেই', মা মাথায় হাত বুলিয়ে আশ্বাস দেয়, 'স্টার্লিংও রবিনের মতো ওই ইস্কুলে পড়তে গেছে।'

'বাট আই নিড্ রবিন। ও বলেছে আমায় ক্লিফোর্ড দ্য বিগ রেড ডগ আর ডোনাল্ড ডাক এঁকে দেবে।'

'দেবে তো। ইস্কুলে লম্বা ছুটি পেলেই বাড়ী আসবে, তখন দেবে। থ্যাংক্‌স্‌গিভিং, ক্রিস্‌মাস --'

'নো-ও-ও'

ব্যাপারটা অবুঝ বায়না আর কান্নাকাটির দিকে গড়ানোর আগেই বাবা টিভির রিমোট টিপে দিল। কার্টুন চ্যানেল। একেবারে মোক্ষম অস্ত্র। সব ভুলে টিভির সামনে বসে পড়ে টুকাই।

* * *   * * *   * * *

ঘুম থেকে উঠেই বাথরুম নয়, ব্রেক্‌ফাস্ট টেবিল নয়, প্রথমেই যেতে হবে দোতলার লিভিং রুমের লাগোয়া কাচের স্লাইডিং ডোরটার কাছে। দেখতে হবে তার মতোই ওরাও ঘুম থেকে উঠল কিনা। ওরা মানে ছোট্ট, একরত্তি দুটো পাখির ছানা। না, বাড়ীতে খাঁচা এনে পাখী পোষা আর শেষ অবধি হয়নি টুকাইয়ের। ওদের বাড়ীর পিছনদিকের একফালি

ঘাসজমিতে যে বেঁটেখাটো জাপানী মেপ্‌ল্‌ গাছটা আছে, তার ওপরের দিকের ডালে একটা ছোট্ট বাসায় থাকে ছানাদুটো। মায়ের আদরে, যত্নে আর সজাগ প্রহরায়।

বড় সুন্দর দেখতে ওদের মা-টাকে। কমলা রঙের বুক আর পেট, কমলা রঙের ঠোঁট। মাথা, পিঠ আর ডানাদুটো গাঢ় কালচে খয়েরী। চোখদুটোকে ঘিরে আবার গোলগোল সাদা বর্ডার। দিনের বেশীরভাগ সময়টাই বাসায় বসে বাচ্চা আগলায়। মাঝে মাঝেই বাবা পাখীটা ফুড়ুৎ করে আসে, ঠোঁটে করে আনা খাবারটা দিয়ে আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে যায়। ছানাদুটোর অবশ্য পালকটালক গজায়নি এখনো। পালক না থাকলে পাখীদের যে এরকম দেখতে হয়, টুকাইয়ের ধারণাই ছিল না। ওদের মাথাটা বাকি শরীরের অনুপাতে বেশ একটু বড়, ঠোঁটের ধার বরাবর উজ্জ্বল হলুদ দাগ। যতক্ষণ জেগে থাকে, খানিক বাদে বাদেই ঠোঁটদুটো ফাঁক করে খেতে চায়। আগে গলা দিয়ে আওয়াজও বেরোতো না, এখন কাচের দরজা ফাঁক করলে চিঁ-চিঁ শোনা যায়। মা-পাখী তখন মুখের ভেতর থেকে উগরে উগরে ওদের খাওয়ায়। এইটুকু বয়স, এখনই একজন আরেকজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে — কে কত বড় হাঁ করতে পারে, কে কত জোরে চিঁ-চিঁ করতে পারে। অনেকটা যেন টুকাই দুবছর বয়সে প্রথম যখন কলকাতায় মামার বাড়ী গিয়েছিল, ওর চেয়ে এক বছরের বড় মামাতো দাদা যেমন ওর সঙ্গে আদর পাওয়ার প্রতিযোগিতা করত, হাতদুটো ওপরদিকে টানটান করে বাড়িয়ে দিয়ে বলত ‘কোয়ে কোয়ে, কোয়ে কোয়ে, আমাই, আমাই’ — সেরকম। টুকাই ওদের দুটো নামও দিয়েছে — আর্নি আর বার্ট। ওর সবচেয়ে প্রিয় দুই সেসেমি স্ট্রীট চরিত্র।

অথচ এই কিছুদিন আগেই ওরা ছিলনা। ছিল নীলচে রঙের ছোট ছোট দুটো ডিম। মা-পাখী তাদের ওপর বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তা দিত। সারা রাত তো বটেই। তারপর সকালে টুকাই কাঁচের দরজাটায় গিয়ে দাঁড়ালেই পাখীটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাত ওর দিকে। একটু ভয়-ভয় সন্দিগ্ধ ভাব — যেন ভাবছে এ আবার কে রে বাবা, ডিম কেড়ে নিতে আসবে নাকি? খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বিপজ্জনক কিছু না দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার তা দিতে বসত। বাসাটাও কম খাসা নয়। কীভাবে একটু একটু করে অনেক চেষ্টায়, অনেক যত্নে ওটা বানিয়েছে পাখীদুটো — টুকাই না দেখলে বিশ্বাস করত না। এপ্রিলের এক ঠান্ডা-ঠান্ডা ভোরে ও ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজতে মাজতে দোতলার লিভিং রুমে এসে দেখে ঐ পাখীদুটো ওদের জানলার কার্নিসে বসে একে অপরের গা ঘষাঘষি করে আদর করছে।

‘মা, দেখনা, ওরা ওরকম করছে কেন?’

‘ওরা খুব বন্ধু তো, তাই’।

তারপর প্রায় মাসখানেক ধরে যখনই ওদের দিকে চোখ পড়েছে, দেখেছে হয় ওরা বাগানের এ-গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে উড়ে ঠোঁটে করে ভাঙা ডাল বা কাঠিকুঠি যোগাড় করছে, নয়তো জাপানী মেপ্‌লের ডালের খাঁজে গোল করে সেগুলো সাজিয়ে বাসার কাঠামো বানাচ্ছে। এমনিতে ভার্জিনিয়ায় এবারের শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল, এপ্রিলের গোড়া অবধি বরফ গলেনি। এপ্রিলের শেষেও গাছটাছ সব পাতাহীন শুকনো ঝাঁটারকাঠি। তাই বাসা তৈরীর উপকরণের অভাব নেই। কাঠামো তৈরী হয়ে গেলে তাতে দেওয়া হল সদ্য-বেরোনো কচি ঘাসের আর মস্‌-লাইকেনের লাইনিং। মে মাসের এক বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে হঠাৎ বাসাটার দিকে তাকাতেই টুকাই দেখে আরে! নীলরঙের গোলমতো ওটা কী? উত্তেজনায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে মাকে কথাটা বলতেই মা বলল, ঐ গোল জিনিসটার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট টুকাই বেরোবে। বেরিয়েই বলবে ‘আই ওয়ান্ট দুধু, আই ওয়ান্ট জুস্‌’।

‘ধ্যাৎ, বলোনা ঠিক করে। বাবা, দেখতো ঐটা কী।’

‘ওটাকে বলে ডিম। এগ্‌। তুমি ব্রেকফাস্টে খাওনা মাঝে মাঝে? আমি তো আজ বাজার থেকে আনতে ভুলে গেছি, তাই কাল সকালে ওটাই তোমাকে সেদ্ধ করে দেবে মা।’

যাইহোক, দুদিন বাদে স্কুল থেকে ফিরে আবার সারপ্রাইজ। আরো একটা ডিম! তবে মা-পাখী যতক্ষণ বাসায় আছে, দেখে বোঝার উপায় নেই। সবসময় ওগুলোর ওপর বসে শরীর দিয়ে আগলে রেখেছে। এখন স্লাইডিং ডোর খুলে টুকাই গাছটার দিকে হাত বাড়ালে বা বিস্কুট-পাউরুটির টুকরো ছুঁড়লেও পাখীটা উড়ে পালায় না, কিরকম একটা বিরক্ত-বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে। ভাবখানা যেন ‘আঃ, আবার ঝামেলা করছ? দেখছ না আমার অবস্থা?’ তো, বেশ কিছুদিন এরকম চলার পর মেমোরিয়াল ডে উইকএন্ডে ওরা যখন ওয়াশিংটন ডি সি

বেড়িয়ে ফিরল, দেখে ডিম-ফিম আর নেই, মা-পাখীটা ঠোঁট দিয়ে আলতো করে খুঁটে খুঁটে দুটো জলজ্যান্ত বাচ্চার গা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। সেই থেকে প্রতিদিন সকালে বিছানা ছাড়ার পর টুকাইয়ের ঐ রুটিন।

***   ***   ***

এলিমেন্টারি স্কুলের প্রথম বছরের শেষে যে আড়াই মাস লম্বা গরমের ছুটি, সেটা টুকাইয়ের কী অসাধারণ কেটেছে — বলে বোঝানো যাবেনা। একদিকে চোখের সামনে একটু একটু করে আর্নি আর বার্টের বড় হয়ে ওঠা, অন্যদিকে প্রায় দশমাস পরে ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ী ফেরা রবিন্ আর স্টার্লিং-এর সঙ্গে রোজ গল্পগুজব খেলাধূলো। ওরা যেমন ওদের নতুন 'ইস্কুলের' গল্প টুকাইকে শুনিয়েছে, ও-ও হিলক্রেস্ট এলিমেন্টারি স্কুলের কোনো কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে বাকী রাখেনি। দেখা গেল, রবিন্ আর স্টার্লিং-এর 'ইস্কুলে' অংক, ইংরেজী এসব হিলক্রেস্টের তুলনায় একটু বেশী শেখালেও কীকরে সান্‌ফ্লাওয়ার সীড্ দিয়ে কুকি তৈরী করতে হয়, কীকরে প্লাস্টিকের সোডা-বোতল কেটে রকেটশিপ বানাতে হয়, কীকরে মডেলিং ক্লে দিয়ে বানি র‍্যাবিট গড়তে হয় — এইসব দরকারী জিনিসগুলো মোটেই শেখায়নি। টুকাই কিন্তু এখন ওসবে এক্সপার্ট। তবে স্টার্লিং একটা দারুণ জিনিস তৈরী করে দিয়েছে ওকে। বার্ড ফিডার। ওদের বাবা যেহেতু একজন মেকানিক, গ্যারাজে যন্ত্রপাতির অভাব নেই। সেসব দিয়ে খেটেখুটে বেশ সুন্দর একটা কাঠের বার্ডফিডার বানিয়ে টুকাইদের ব্যাক্‌ইয়ার্ডের সবচেয়ে উঁচু গাছটার ডালে মই দিয়ে উঠে টাঙিয়ে দিল। আর তাতে বার্ড্‌সীড্ ভরে দিতেই আর্নি আর বার্টের মায়ের তো পোয়াবারো। মাঝেমাঝেই উড়ে এসে ওটার গায়ে বসে আর ঠুকরে ঠুকরে খায়। পাশের গাছেই নিজের বাসা, তাই খাবার খুঁজতে গিয়ে বাচ্চাদের চোখের আড়াল করতে হচ্ছেনা। অবশ্য রবিন্ এরমধ্যে যতবারই স্টকিকে নিয়ে ওদের বাড়ীতে এসেছে, কাঁচের দরজার এপার থেকে আর্নি আর বার্টের ঝটাপটি দেখে আর কিচিরমিচির শুনে কুকুরটার কী ভৌ ভৌ চিৎকার। ভাগ্যিস স্লাইডিং ডোরটা সাউন্ডপ্রুফ। বাচ্চাদুটোর চেহারায় এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। গায়ে তুলোর মতো নরম পালক। টুকাই বাবার কাছে শুনেছে ওটাকে বলে ডাউন্‌স্। ডানা এখনো ভাল করে তৈরী হয়নি, কিন্তু সেগুলোই ঝাপটাবার চেষ্টা করে। মা-পাখীটা খাবার এনে দিলে দুজনে তা নিয়ে কাড়াকাড়িও করে। টুকাইয়ের ভয় হয় — পড়ে যাবে না তো বাসা থেকে? ওদের আশপাশের অনেক বাড়ীতেই বেড়াল আছে। তারা এরকম স্ন্যাক্ ছেড়ে দেবে?

এমনি করেই একসময় জুলাই গিয়ে অগাস্ট পড়ল। আশপাশের পুকুর-ঝিল-হ্রদ থেকে কানাডা গুজ্ আর ক্রেন্‌দের এবার আস্তে আস্তে সপরিবারে দক্ষিণদিকে পাড়ি দেবার পালা। সারাদিন তাদের কলরবেই চারিদিক মুখর। হামিংবার্ডরাও ওদের মতো পরিযায়ী পাখী। প্রায়ই টুকাইদের বার্ডফিডারে হামিংবার্ড আসে খাবারের খোঁজে। ওদের জন্য বার্ডফিডারের গায়ে ফুটো-ফুটো করা আছে, তাতে মধু ভরা থাকে। প্রথমবার হামিংবার্ড দেখে টুকাই তো বিশ্বাসই করতে চায়না ওটা পাখী। একটা বড়সড় বোলতার মতো সাইজ। ওদিকে আর্নি আর বার্টের ডানায় এখন আগের চেয়ে জোর বেড়েছে। মাঝেমাঝে দমকা হাওয়া দিলে ওরা ডানায় ভর করে বাসার মধ্যেই ছোট ছোট লাফ দেয়। মা-পাখীও ওদের উড়তে শেখানোর চেষ্টা শুরু করেছে। টুকাইকে ছ-সাত মাস বয়সে তার মা-বাবা যেমন করে হামা দেওয়া শেখাতো, কিছুটা সেভাবেই। ওকে মেঝেতে বসিয়ে একটা বল বা খেলনা ওর থেকে একটু দূরে রেখে মা বলত 'আয় আয়, নিয়ে যা, নিয়ে যা'। আর ও চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হাঁচোড়পাঁচোড় করে এগোনোর চেষ্টা করত। এক্ষেত্রেও মা-পাখী খাবার নিয়ে সোজা বাসায় না এসে একটু দূরের একটা ডালে বসে বাচ্চাদুটোকে ডাকে, আর ওরা খিদের চোটে বাসার একদম কিনারায় গিয়ে ডানা ঝাপটাতে থাকে। রবিন্ ব্ল্যাক্‌স্‌বার্গে ফেরার আগে টুকাইকে বলে গেল, ও ওর স্মার্টফোনে বাচ্চাদুটোর স্ন্যাপ্‌শট তুলে নিয়েছে। সেই দেখে দেখে অবসর সময়ে 'ইস্কুলে' বসে ওদের একটা ছবি আঁকবে আর থ্যাংক্সগিভিং-এ বাড়ী এসে টুকাইকে সেটা দেবে। দুই ভাইবোনই ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে একদিন ওদের 'ইস্কুল' ঘুরিয়ে আনবে।

লেবার ডে-র পর স্কুল খুলতেই টুকাইয়ের সেকেন্ড গ্রেড। নতুন নতুন টিচার, নতুন নতুন বই। চারপাশের প্রকৃতিও প্রত্যাশিতভাবে পাল্টাতে শুরু করেছে। সকাল-সন্ধ্যে হাওয়ায় কেমন একটা শির্‌শিরে ভাব। দিন ছোট হয়ে আসছে একটু একটু করে। টানা পাঁচমাস একঘেয়ে সবুজ

ইউনিফর্ম পরে গাছেরা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কোনো এক অদৃশ্য ফ্যাশন্ ডিজাইনার নিঃশব্দে এসে লাল, হলুদ, কমলা, খয়েরী আর সোনালির চোখধাঁধানো সাজে সাজিয়ে দিচ্ছে তাদের। আর ওদের গা থেকে উদাসী হাওয়ায় খসে খসে পড়ছে সেইসব রঙের টুকরো, মাটিতে তৈরী হচ্ছে রঙীন গালচে। একদিন বিকেলে স্কুলবাস টুকাইকে বাড়ীর সামনে নাবালো যখন, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। মা অ্যাপ্রন গায়ে ওভেনে ওর জন্য কাপ্‌কেক তৈরী করছে টিভি দেখতে দেখতে। রোজকার মতো ও গিয়ে ঢুকল ওর খেলাঘরে। লেগো আর বিল্ডিং সেট নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ল। এসবে আজকাল ওর এত আগ্রহ দেখে মা মাঝে মাঝে বাবাকে বলে, 'তুমি ইকোনমিক্স, আমি আর্ট্‌স্ — ছেলে তো মনে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হবে।' বাবা স্বভাবসিদ্ধ মজারু ভঙ্গীতে উত্তর দেয়, 'বলা যায়না, খেলনার দোকানের কর্মচারীও হতে পারে।' আজ অবশ্য খানিকক্ষণ পরে মা হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল একটু পাশের বাড়ী যাচ্ছে, টেবিলে কাপ্‌কেক আর চিকেন নাগেট্ রাখা আছে, ও যেন নিজে নিজে খেয়ে নেয়।

খেয়েদেয়ে বেশ খানিকক্ষণ খেলার পর একঘেয়েমি আসতে টিভি দেখবে বলে যেই দোতলার লিভিং রুমে গেছে, অমনি টুকাইয়ের মনে পড়ে গেল আর্নি আর বার্টের কথা। তাড়াতাড়ি স্লাইডিং ডোরের সামনে এসে দেখে — একী! বাসাটা ফাঁকা কেন? বিকেলের আলো পড়ে এসেছে তখন, সন্ধ্যে নামতে বেশী দেরী নেই। দোতলার ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়িয়ে এ-গাছে ও-গাছে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে থাকে ওর চোখদুটো। কেউ কোত্থাও নেই। না বাচ্চাদুটো, না মা-পাখীটা। কেবল ঝুলন্ত বার্ডফিডারটাকে ঘিরে একদল ব্ল্যাক্‌বার্ড ঠোকরাঠুকরি করছে। নিমেষে একরাশ দুশ্চিন্তায় ছেয়ে যায় ওর মন। তবে কি ওরা উড়তে শিখে গেছে? উড়ে চলে গেছে অন্য জায়গায়? নাকি কাল সায়েন্স ক্লাসে মিস্ লরেন্স যে র‍্যাপ্টর বার্ডগুলোর কথা বলছিলেন — ঈগল, অস্‌প্রে, হক, কেস্ট্রেল — তাদেরি কেউ এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে? কিন্তু তাহলে তো বাসায় একটা ঝটাপটির চিহ্ন থাকবে! ছেঁড়া পালকটালক বা ভাঙা কাঠিকুঠি তো নজরে পড়ছে না। তবে কি — তবে কি এতদিন ধরে যে ভয়টা করত সেটাই হল? কোনোভাবে বাসা থেকে পড়ে গেছে ওরা? আর আশপাশের বাড়ীর বেড়ালগুলো —

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে বাইরের দরজা খুলে উঁকি দিয়ে মাকে খুঁজতে থাকে ও। সেই কখন গেছে, এখনো ফেরার নাম নেই। কিন্তু ড্রাইভ্‌ওয়েতে ওদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে যে! তার মানে বাবা এসে গেছে অফিস থেকে? কই, রোজকার মতো টুংটাং বেল বাজালো না তো আজ? দরজা তো বন্ধই ছিল! কে জানে, হয়তো মা ফোনে বলেছে মিসেস উইল্‌সনদের বাড়ীতে আছে, তাই ওখানেই গেছে। আর মিসেস উইল্‌সনদের বাড়ীতেই বা আজ হচ্ছেটা কী? বেশ কয়েকটা গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ীটার সামনে। একটা ছোটখাটো জটলা। কেউ কেউ এনেছে ফুল, কারো কারো হাতে আবার টেডি বেয়ার। হাতে বড় বড় ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকজন। তবে কি আংক্‌ল্ বা আন্টির বার্থডে? গ্রোন্‌আপ-দের বার্থডেতে ছোটদের বলেনা বুঝি?

অদম্য কৌতূহলে এক পা এক পা করে হেঁটে লন পেরিয়ে উইল্‌সনদের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ায় টুকাই। দরজা খোলা, বাড়ীর ভেতরেও কিছু লোকজন। বেশীরভাগ এই পাড়ারই বাসিন্দা, টুকাইয়ের মুখচেনা। ডাইনিং রুম আর লিভিং রুমে জড়ো হয়ে নীচুস্বরে কথাবার্তা বলছে সবাই। তাদের কাটিয়ে বাড়ীর পিছন দিকটায় স্টার্লিং-এর শোবার ঘরে যেতেই মাকে দেখতে পেল ও। বাবাকেও। মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন মিসেস্ উইল্‌সন। পাশের সোফায় বাবা মুখ নীচু করে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে বসে। শূন্য, নিথর দৃষ্টি। আর কোণের দিকের স্টাডি টেবিলটায় দুহাতে মুখ ঢেকে মিস্টার উইল্‌সন। যেন জগৎসংসার থেকে প্রাণপণে নিজেকে আড়াল করে একটু একা থাকতে চাইছেন।

ঘরের নৈঃশব্দকে খানখান করে ক্রমাগত কথা বলে চলেছে একটা ফ্ল্যাট-স্ক্রীন টিভি। তার আওয়াজ ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে। তার পর্দায় ঝলসে উঠছে একের পর এক খন্ডচিত্র। পাহাড়ের কোলে ছবির মতো এক ইউনিভার্সিটি টাউন। ব্ল্যাক্‌স্‌বার্গ, ভার্জিনিয়া। সেখানকার ইউনিভার্সিটির পথে পথে বিছানো ওক-মেপ্‌ল্-জুনিপারের ঝরাপাতার গালচেয় আজ রক্তের দাগ। কোন্ এক নিঃসঙ্গ, দলছুট, মানসিক বিকারগ্রস্ত ছাত্র তার প্রতি কিছু কিছু সহপাঠীর ব্যঙ্গবিদ্রূপ, লাঞ্ছনা আর মানসিক উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে নিজের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, ক্রোধ আর ঘৃণা উগরে দিয়েছে বন্দুকের নলে। জ্বলন্ত

প্রতিহিংসায় কেড়ে নিয়েছে বাইশটা তরতাজা প্রাণ। বাইশটা বুলেটে। তেইশ নম্বরটা সে বরাদ্দ করেছিল নিজের জন্য। এক নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত যান্ত্রিকতায় টিভির ঘোষিকা বারবার পড়ে চলেছেন নিহত ছাত্রছাত্রীদের নাম --

ফ্রেশম্যান জেসিকা পার্কার, জুনিয়র ল্যান্ডন্ মার্টিন্, ফ্রেশম্যান টমাস বেনেডিক্ট, সোফোমোর রবিন্ উইল্সন, সিনিয়র মেলানি ব্রাউন, সোফোমোর স্টার্লিং উইল্সন ---

ভার্জিনিয়ার এক ছোট্ট, নিরিবিলি শহরের এক গাছপালাঘেরা প্রান্তে দুটো পাশাপাশি বাড়ীর পাখীরা আজ বিদায় নিয়েছে। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না তারা। কোনোদিনও না।

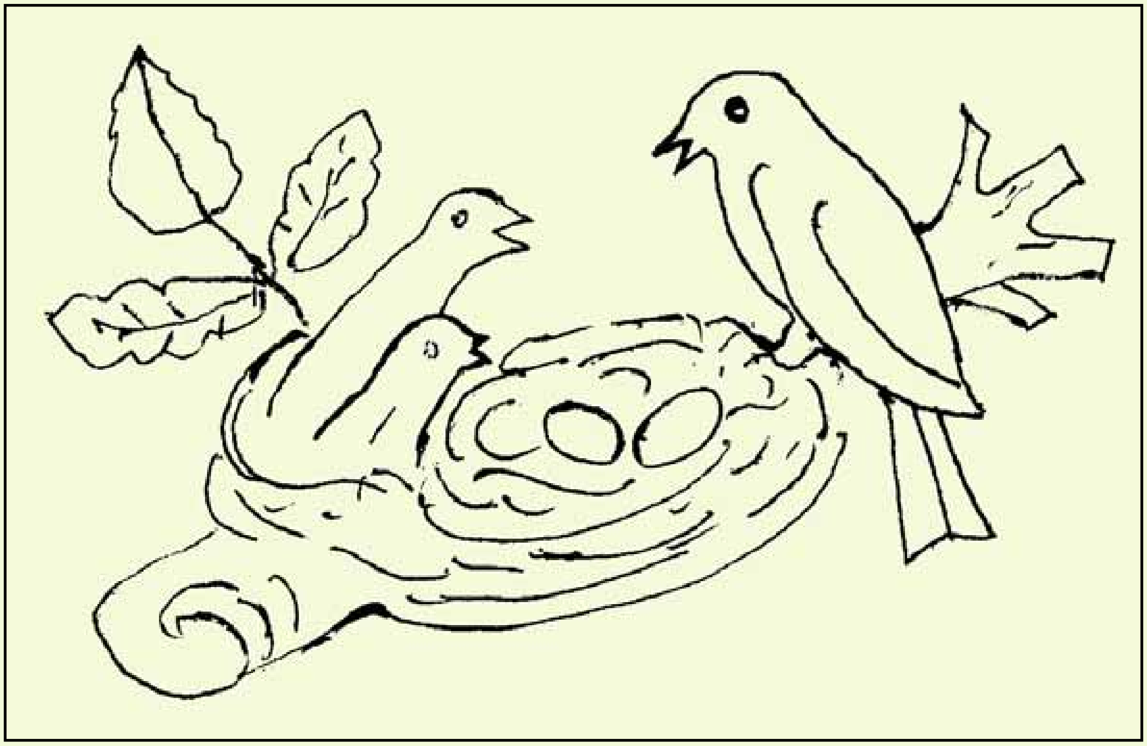

স্মৃতি

বানী ভট্টাচার্য্য, Chicago

রেডিওতে প্রতিমা যখন শুনলো আবার একটা ছেলে বাবামা দুজনকেই হত্যা করেছে, তখন প্রতিমার হাত পা কাঁপতে লাগলো। প্রতিমার ফেলে আসা জীবনের দিনগুলির অনেকগুলো কথাই আজ খুবই মনে হলো, বিশেষ করে যখন ছেলেরা ছোট ছিল, তাদের কথাই। মনে মনে ভাবে সে সেই মধুর দিনগুলোর কথা। তখন কিন্তু প্রতিমার কাছে দিনগুলো ছিল খুবই কঠোর। নানা কাজকর্ম্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকতো প্রতিমা, কিন্তু সময় পেলেই লোকেদের সাথে আর বন্ধুদের সাথে একসঙ্গে হতো যখন কথার বেশীর ভাগই থাকতো প্রতিমার ছেলেমেয়েদেরই নিয়ে।

বেশ অনেক বছর আগে প্রতিমার ছেলেরা যখন ছোট ছিল, হঠাৎ একদিন প্রতিমার কাজেরই এক বন্ধু, অমিতা বলেছিল, 'জানো, আমার পাঁচ বছরের ছেলের দুরন্ততার জন্যে আজ আমি পুলিশের কাছ থেকে একটা টিকিট পেয়ে গেলাম। প্রতিমা অবাক হয়ে বলেছিলো 'তুমি পুলিশের কাছ থেকে টিকিট পেয়েছো, কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা তোমারই দোষের জন্যে। তুমি আবার ছেলের দোষ দিচ্ছো কেন ?' অমিতা বলেছিল, 'আগে সব ব্যাপারটা ধৈর্য ধরে শোনো তারপর মতামত দিস্।' বড়দিনের সময় যেমন লোকেরা ঘন্টা বাজিয়ে থালা রেখে সালভেশান আর্মির জন্যে টাকাপয়সা জোগাড় করে, সে রকম একজন লোককে ফুটপাতের কাছে দেখে গাড়িটা থামিয়ে একটুক্ষণের জন্যে তাড়াতাড়ি করে পয়সাটা দানসংগ্রহণের বাস্কতে ফেলতে গিয়েছি, ইতিমধ্যে আমার পাকা ছেলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেই আমার কাছে ছুটে আসতে গেছে, এক পুলিশ তার হাত ধরে এনে আমার কাছে দিয়ে, তারসঙ্গে আমাকে একটা একশো টাকার টিকিট লিখেই শুধু ছাড়লো না, তারপরেও আমার ওপর এক বিরাট উপদেশ ছাড়লো, উনি নাকি দয়া করে আমাকে খুব লঘু দন্ড দিলেন, এরকম সাংঘাতিক কাজ করা আমার নাকি একেবারেই উচিৎ হয়নি। বুঝতেই পারছো আমার ভাল কাজের এই হলো পরিনাম।'

অমিতার কথার পরে চৌখস প্রতিমা কিন্তু সেদিন চুপ করে থাকেনি। কিছুতেই হারবে না প্রতিমা কারুর কাছেই আর কোনো ব্যাপারেই নয়। কাজেই তারও কিছু যোগ করা চাই। কিন্তু কি বলবে সে ছেলেদের সম্বন্ধে। মিথ্যে কথাও বলতে পারে না প্রতিমা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রতিমার অতীতের একটা ঘটনা। তাই তখনই বলে উঠেছিল প্রতিমা, 'আমার ছেলেরাই কি দুরন্ততে কম যায় নাকি ! জানিস্ বিকেলে আমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই সন্ধ্যের সময় ডিনার মিটিংএ যেতে হয়। রাত্রির বেলা বলে, আমরা একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক বেবীসিটার জিনিকে ঠিক করেছিলাম। আমার ছেলের কিন্তু তাঁকে একেবারেই পছন্দ নয়, কারণ, তিনি নাকি আমার সাড়ে চার বছরের ছেলের সঙ্গে ঝাপাঝাপি করতে পারেন না বেসমেন্টে বল খেলতেও পারবেনা আমার ছেলে আকাশের সাথে। আমি ছেলের কথায় কান না দিয়ে তার কাছে আকাশকে রেখে একদিন বিকেলে বেরিয়ে ছিলাম। কেন জানি না, আমাদের সেদিন একটু তাড়াতাড়িই আটটা নাগাদ মিটিংটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিয়েই বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলাম। গ্যারাজ খোলার শব্দ পাওয়া মাত্র ছেলে ছুটে এসেছিলো, কে এলো দেখতে কারণ আমি আকাশকে খুব করে বুঝিয়ে বলে গিয়েছিলাম আমার ফিরতে রাত হবে, তাই ও ভাবতেই পারেনি আমরা এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। ছেলেকে জিজ্ঞেস করা মাত্র জিনি কোথায়, আকাশ আঙুল তুলে ইঙ্গিতে বোঝালো জিনি ওপরে। আমি একটু অবাক হলাম। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম 'ওপরে কি করছে জিনি।' আকাশ বললো, 'বাথরুমে।' ছেলের সঙ্গে একটু কথা বলার পর মনে হলো আমার, এখনো তো জিনিকে দেখছি না। আমি ওপরে গিয়ে ছেলের ঘরে ঢুকে দেখি বাথরুমের দরজাটা বন্ধ আর দরজার ওদিক থেকে দুমদাম আওয়াজ আসছে আর তারসঙ্গে জিনির ভাষা ভাষা গলা, 'দরজাটা খুলে দে সোনা, তোকে বিছানাতে শুতে যেতে হবে না। আমি দেখি আমার পেছনে পেছনে ছেলেও ওপরে উঠে এসেছে। ছেলে বললো, 'দেখেছো, জিনি আন্টি সেপ্টিপিন

দিয়ে তোমার মতো কি করে দরজা খুলতে হয় তাও জানে না। নাদিয়া তো জানে।' নাদিয়া হচ্ছে একজন ইয়াং মেয়ে, যে হচ্ছে আমার ছেলের দুপুরের রেগুলার বেবীসিটার। আমার ছেলের, বন্ধ বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে কি করে খোলা যায় সেটা ভালো করেই জানা ছিল। কারণ আকাশ ছোট থাকতেই বাথরুমের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করা যাতে না যায়, তাই দরজার লকটা ডিসেএবেল করে রেখেছিলাম। কিন্তু যদি বাইরের কেউ না জেনে দরজাটা বন্ধ করে দেয় বাইরে থেকে, তাহলে ভেতরের লোককে দরজার লকের গর্ত্তর মধ্যে সেপটিপিন ঢুকিয়ে দরজাটা খুলতে হয়, সেটা ছেলে আমাকে করতে দেখেছে একদিন, যখন অতীতে আমি ছেলেকে নিয়ে বাথরুমের ভেতরে ছিলাম আর আমার স্বামী না জেনে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গিয়েছিল না ভেবেই। আমি তাড়াতাড়ি করে দরজাটা খুলে দিতে যাচ্ছি যাতে জিনি বেরতে পারে, ছেলে আমাকে আবার বললো, 'জিনি আন্টিকে টাইম আউট করেছি কারণ আমাকে নটা বাজার আগেই শুতে যেতে বলেছে। আজকে শুক্রবার, আমার নটা পর্যন্ত জেগে থাকার কথা জিনি আন্টি সেটাও শুনতে চায় না আমার কাছ থেকে।' আমি তো এ সব কথা শোনার পরে আমারই নিজের ছেলেকে নিয়ে কি করবো ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি আমার স্বামীর দিকে তাকাতেই আমার স্বামী বলে উঠলেন, 'বলেছিলাম না, দরজার লকটা একেবারেই দুদিক থেকেই ডিসএবেল করে রাখতে, যেমন শোনোনি আমার কথা এখন ভোগো।' আমি আমার স্বামীর দিকে কঠোর চোখে তাকিয়ে ছেলেকে বললাম 'তোমার সাথে কথা আছে' বলে তাড়াতাড়ি করে দরজাটা খুলে জিনিকে বললাম 'আমি খুবই সরি।' জিনি বললো 'ভাগ্যিস্ তুমি ফিরে এসেছো তাড়াতাড়ি করে। আমি আমার জন্যে ভাবছিলাম না। আমার ভাবনা হচ্ছিল একলা থাকাতে তোমার ছেলে আবার কি দুষ্টুমি করে বসে।' আমি অনেক এপোলজি চেয়ে আর বেশী টাকা দিয়ে অবশেষে জিনিকে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়াতে জিনি খুশী মনেই 'আমাকে আবার ডেকো' বলে প্রস্থান করেছিল। এত বড়ো কাহিনীটা বর্ণনা করার পর সন্তুষ্ট হয়ে প্রতিমা অমিতার মুখের দিকে সরাসরি তাকালো।

অমিতা বলে উঠলো 'মা হওয়া কি মুখের কথা?'

প্রতিমা মনে মনে ছেলেকে খারাপ করার কমপিটিশানে ও জিতে গেছে মনে করে নিজেই সন্তুষ্ট হয়ে বলে উঠলো 'আমার কাছে সেটা এক্কেবারে ধ্রুব সত্যিরে, অমিতা।'

সেই চেনা / অচেনা পাখিটা

শাশ্বতী ভট্টাচার্য, Madison, Wisconsin

আট-কুঠুরী, নয়-দরজা আঁটা, মধ্যে মধ্যে ঝরকাকাঁটা, তার উপরে সদর কোঠা আয়না মহল তায়ে। সেখানে তাকে দেখতে পাই। সেই পাখিটাকে, 'আমি' যার নাম।

আমি ? কে আমি ?

আমি শিল্পী . . ., গায়ক . . ., ভিখারী . . ., কি জানি !

আমার সেই 'আমি'টা আমার শরীরের ঠিক কোথায় ?

নিঃসন্দেহে বহু যুগের একটা পুরনো প্রশ্ন।

প্রায় সাড়ে তিনশো খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। অ্যারিস্টোটল হৃদয় (Heart) এর পক্ষে ছিলেন। উনি বিশ্বাস করতেন, হৃদয় সমস্ত চিন্তা ভাবনা অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে। অপর দিকে হিপোক্রেটিসের ধারণা ছিল মস্তিষ্ক (brain) আনন্দ বা দুঃখের উৎস।

১৮৯৫ সাল। লন্ডনে ''রিলিজিয়ন অফ লাভ'' (Religion of Love) বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, We need a heart to feel, a brain to conceive, and a strong arm to do the work। সেই একই বক্তৃতায় স্বামীজী হৃদয়কে স্থান দিয়েছেন মস্তিষ্কের অগ্রে। উপদেশ দিয়েছেন, In a conflict between the heart and the brain follow your heart (২) আজকের এই ইলেক্ট্রোনিক্সের যুগে বসে আমি ভাবতে পারি, মহান পথপ্রদর্শক এই দার্শনিকের মতবাদ সম্ভবতঃ এনাদের একান্ত নিজস্ব জীবনোপলব্ধির ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে।

আমার যেমন দেখুন না, বকর বকর করতে খুব ভাল লাগে। ছোটকাকা আদর করে ডাকতেন, চ্যাটার বক্স। আমার সারা শরীরের অনুমানিক একশো হাজার গুনিতক একশো কোটি কোষের ঠিক কোনটি সেই 'আমি সত্তার' সর্বোত্তম প্রতিনিধি ? ভাবতেই পারি আমার 'আমি'টা আছে আমার জিভের ডগায়। আপনার নিজের উত্তরটা ভেবে নিয়েছেন তো ? আপাততঃ না হয় সেটা গোপনই থাক ?

যদি প্রশ্ন করা হয় ক্লোন করার উদ্দেশ্যে আপনার শরীরের একটা কোষ আমার দরকার, কোথা থেকে সেটা সংগ্রহ করব ? আন্দাজ করতে পারি, আপনি হৃদয় কিম্বা ব্রেন (শুদ্ধ বাংলায় স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র, মাথার ভিতর অবস্থিত ধূসর পদার্থ বা মস্তিষ্ক) এর কথা ভাবছেন।

শুধু আপনি কেন, আমেরিকার বিখ্যাত রাইস ইউনিভার্সিটির জেসি জোন্স গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ বিজনেসের হায়ো এডাম আর ওটিলিয়া ওবোডারু এবং কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির কলম্বিয়া বিসনেস স্কুলের সাথে যুক্ত এডাম গ্যালিন্সকির সাম্প্রতিক গবেষণায় (১) অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই এই দুইটি অঙ্গের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন। শুধু তাই নয়, আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক-স্নায়ুবিশারদদের (social neuroscientist) ধারণাও তাই।

পাঠক ভাবতে পারেন, কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্নটাই বা কেন ? তার কারণ, এর ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করছে আপনার অনেক ব্যবহার ও জীবনের বহু ছোট-বড়ো সিদ্ধান্ত এবং পরোক্ষভাবে আপনার উত্তরের ওপর নির্ভর করছে দেশের বর্তমান অর্থনীতি থেকে শুরু করে ছোট-বড়ো নানা নীতি।

আলোচনার সুবিধের জন্য গবেষণার কাজটিকে তিনটে স্তরে ভাগ করে নেওয়া যাক। প্রথম স্তরে আমরা দেখবো দুইটি বয়ান, বা হাইপোথেসিস। দ্বিতীয় স্তরে সেই বয়ানগুলি প্রামাণ্যতা বিশ্লেষণ করবো এবং শেষতঃ, আমরা দেখবো বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে গবেষণাটির যৌক্তিকতা।

গবেষকদের মতে সেই সব মানুষ, যাঁরা নিজেদের স্বাধীনচেতা বা আত্মনির্ভরশীল বলে মনে করেন, তাঁরা সচরাচর ব্রেন-ব্যক্তি, অর্থাৎ নিজেদের 'আমি-সত্তা' কে এঁরা ব্রেনে স্থান দিয়ে থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই ব্রেন-সংক্রান্ত আলোচনায় এঁরা বেশী উদ্দীপিত হবেন, অংশগ্রহণ করবেন। অপরদিকে, যাঁরা নিজেদের বহুর মধ্যে একজন বলে গণ্য

করেন এবং বিশ্বাস করেন তাঁদের 'আমিত্ব' লুকিয়ে আছে তাঁদের হৃদয়ে, তাঁদের নাম দেওয়া যাক হৃদয়-ব্যক্তি। হৃদয়-সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতে এঁরা তুলনামুলক বেশী আগ্রহী হবেন।

নারীপুরুষ মিলিয়ে প্রায় ৫০০ জনের মধ্যে নানা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে দেখা গেলো ৪৬% অংশগ্রহণকারী নিজেদের ব্রেন-ব্যক্তি বলে মনে করেন, এবং এঁদের বেশীর ভাগই পুরুষ। পৃথিবীর বহু দেশে মরণোত্তর অঙ্গদান প্রথা চালু রয়েছে। কাল্পনিক এক দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি অঙ্গ এবং সম্পতি দান করার পরিস্থিতি আসে, ব্রেন-ব্যক্তিরা সম্পত্তির এক বড়ো অংশ তাদেরকেই দিয়ে যাবেন যারা তাঁদের ব্রেন পেয়েছে। এখানে স্বনির্বাচিত অঙ্গের মাধ্যমে অন্য একটি মানুষের শরীরে বেঁচে থাকার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

স্বাধীনচেতা বা আত্মনির্ভরশীল প্রকৃতির বেশীরভাগ মানুষ নিজেদেরকে ব্রেন-ব্যক্তি ভেবে থাকেন, এই তথ্যটা প্রমাণ করার জন্য গবেষকেরা একটি চিত্তকর্ষক উপায় অবলম্বন করলেন। অংশগ্রহণকারীদের পূর্বপ্রস্তুত করে নিলেন নির্দিষ্ট এক প্রসঙ্গে রচনা লেখা এবং পড়ার মাধ্যমে। অংশগ্রহণকারীদের দুই ভাগে ভাগ করে নিয়ে একদলকে বলা হলো, তাঁরা যে রীতিনীতি বাছ-বিচারের নিরিখে অন্য আর পাঁচটা চেনাজানা জনসাধারণের বা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে আলাদা — সেই নিয়ে একটি রচনা লিখতে। আন্দাজ করা যায় এই ধরণের লেখা লিখতে গেলে মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা 'আমি' চেতনা জাগ্রত হবে। দলগত বা সমষ্টিগত চেতনা জাগানোর জন্য অংশগ্রহণকারীদের অন্য দলটিকে বলা হলো এমন একটা রচনা লিখতে যাতে, একটি সাধারণ মানুষ হওয়ার দরুণ তাঁরা যে এই বিরাট সমাজের সাথে জড়ানো ছোট একটি সত্তা মাত্র, এই বিশেষ চিন্তাটি প্রতিফলিত হয়। পৃথক আর একটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের দুই ভাগের এক ভাগকে পড়তে দেওয়া হলো 'আমি, আমার, আমার জন্য' জাতীয় শব্দবহুল একটা অনুচ্ছেদ। অপর দলের অনুচ্ছেদে ঢেলে দেওয়া হলো 'আমরা - ওরা - আমাদের সবার' ইত্যাদি সর্বনাম। এর পরেই এই দুই দলের কাছে প্রশ্ন করা হলো ক্লোন করার প্রয়োজন যদি ওঁদের শরীরের কোন একটি বিশেষ প্রতিনিধিত্বমুলক কোষ চাওয়া হয়, ওঁরা শরীরের কোথা থেকে ওটা সংগ্রহ করতে বলবেন। গবেষকদের অনুমান সঠিক প্রমাণ করে প্রথম দলের বেশীর ভাগের উত্তর হলো ব্রেন। এইখানেও দেখা গেল বেশীরভাগ পুরুষ নিজেদের ব্রেনকেই বেছে নিয়েছেন। দ্বিতীয় দলে কিন্তু হৃদয়ব্যক্তির সংখ্যা তেমন একটা বাড়লো না।

আধুনিক সমাজে নানা বিতর্ক আছে। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসকে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৫০০ বছর) আধুনিক ডিবেট বা তর্কের জনক ধরা হয় (আমাদের পুরাণের দুর্বাসা বা নারদ মুনিকে তার্কিক বলা চলে কি না, সেই তর্কটা বরং অন্য দিনের জন্য তোলা থাক)। আমাদের এই আলোচনায় দেখবো, আমরা কোন পক্ষ নিয়ে সরব হই সেটা আমাদের 'আমি কোথায় ?' এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করে কি না। গবেষকেরা জীবন এবং মরণ, এই দুটো বির্তকিত বিষয়ের মধ্যে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

কৃত্রিম উপায়ে হৃদস্পন্দন চালু রাখা আছে অথচ ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে কোনো একটি ব্যক্তির ব্রেন সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেছে (ইইজিতে চব্বিশ ঘন্টা অন্তর দুইটি অনুভূমিক রেখা দেখা গেছে, ইত্যাদি) — এমন একজন মানুষকে কি মৃত বলে ঘোষণা করা উচিত ?

অন্য প্রশ্নটি — গর্ভাবস্থায় একটি ভ্রুণকে কখন জীবিত ধরা উচিত ? নিষেকের ঠিক পরের মুহূর্ত থেকে প্রসবের ঠিক আগের মুহূর্ত — অন্ততঃ মানুষের জীবনে বেশ দীর্ঘ একটা সময়ে বহু নারীকে বেছে নিতে হয় গর্ভপাত। কোন অবস্থায় তা নৈতিক ? সাম্প্রতিককালে আমেরিকার আরকান্সো রাজ্যে একটি আইন চালু হয়েছিল, যাতে বলা হয়েছিল, যদি যন্ত্রের সাহায্যে ভ্রূণের হৃদস্পন্দন টের পাওয়া যায়, গর্ভপাতকে অবৈধ বলে গণ্য করা হবে (৪)।

অ্যারিস্টোটলের বক্তব্য অনুযায়ী গর্ভের সহজ তিনটে ধাপ। কোনো নড়াচড়া নেই অতএব জড়াবস্থা (vegetable), গর্ভাবস্থায় ভেসে বেড়াচ্ছে বা ঠেলা মারছে (animal), আর প্রসবের পরে একটি শিশু নিজের মতে চলছে (তখনই সে একটি যুক্তিযুক্ত মানুষ বা rational)। তিনি পুত্র এবং কন্যা সন্তানের গর্ভপাতের সময় ধার্য করে দিয়েছিলেন যথাক্রমে ৪০ এবং ৯০ দিনে (৩)।

পাঠক, এই অবাস্তবতায় হাসছেন নিশ্চই। আর কিছু না হলেও এই বিতর্ক বহুযুগের পুরনো কিনা আপনার সেই সন্দেহ আমি মুছে দিতে পেরেছি। আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে

আমরা এখন একটি মোটামুটি ১২ সপ্তাহ বয়সের ভ্রুণের হৃদস্পন্দন শুনতে পারি। তার বেশ কিছু সপ্তাহ পরে মাপা যায় প্রকৃত ব্রেনস্পন্দন, যদিও ভ্রুণের প্রকৃত ব্রেন-স্পন্দন কি — তা নিয়েও প্রচুর বিতর্কের অবকাশ রয়ে গিয়েছে।

'আমি কোথায় ?' প্রশ্নাদির পরে নারী/পুরুষ মিলিয়ে একশো ছাপান্নজনকে বেছে নিয়ে উপরিউক্ত এই দুটি প্রশ্ন করা হলো। এর মধ্যে অধিক তুখোড় কিছু অংশগ্রহণকারী, যারা বুঝতে পারলেন 'আমি কোথায় ?' প্রশ্নের সাথে বিতর্কিত প্রশ্নগুলির সম্বন্ধ আছে, তাঁদের উত্তর হিসাবের খাতা থেকে বাদ দিয়ে দেখা গেলো নিজেদের ব্রেন-ব্যক্তি মনে করেন এমন অংশগ্রহণকারীদের ৬৮% বিশ্বাস করেন কোনোরকম কার্যকলাপ-রহিত ব্রেন-সম্পন্ন মানুষকে কৃত্রিমভাবে, আর্টিফিসিয়াল ভেন্টিলেটারের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা অনুচিত, অনৈতিক। আরো দেখা গেল, প্রায় একই সংখ্যক মানুষ (৬৭%) ভ্রুণের হৃদস্পন্দন-ভিত্তিক গর্ভপাত নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে (৪)। অপর দিকে হৃদয়-ব্যক্তি বলে চিহ্নিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এই সংখ্যাগুলো আনুপাতিক ভাবে কম (৩৪% ও ৩৯%)। বুট-স্ট্র্যাপিং নামক জটিল সংখ্যাতত্ত্ব প্রয়োগ করে গবেষকেরা দেখলেন, ভ্রুণের হৃদস্পন্দন-ভিত্তিক গর্ভপাত সিদ্ধান্তর অনৈতিকতা দস্তুর মতো একজন ব্যক্তির 'আমার আমিটা শরীরের কোথায় ?' ধারণার উপর নির্ভরশীল।

এর পরের পর্যায়ে, অনুরূপ একটি পরীক্ষাতে অংশগ্রহণকারীদের ভাগ করে নিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে বোঝানো হলো যথাক্রমে ব্রেন এবং হৃদয়ের তাৎপর্য। তারপরে এঁদের যথাক্রমে অ্যালজাইমার্স, পারকিনসন্স কিম্বা করোনারী আর্টারী সংক্রান্ত গবেষণার জন্য চাঁদা তোলার চিঠি লিখতে অনুরোধ করা হলো। মাপা হলো কে কতোটা মনোনিবেশ করছে, সময় দিচ্ছে, কতো লম্বা চিঠি লিখছে। গবেষকদের আন্দাজ মিলিয়ে দেখা গেলো হৃদয়ব্যক্তিরা ব্রেনের চাইতে করোনারী আর্টারী বা হৃদয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে দ্বিগুন মননশীল, ব্রেন-ব্যক্তিরা ব্রেনের অসুখে ঠিক ততটাই। অতএব, একজন মানুষ কী সামাজিক পরিস্থিতিতে বড়ো হয়েছে তা যেমন নির্ধারণ করে সে ব্রেনভিত্তিক হবে না হৃদয়ভিত্তিক হবে, সেইভাবেই একজন ব্রেন-ব্যক্তি বা হৃদয়-ব্যক্তি সমাজকে গঠন করে, তার আইন কানুন মতবাদকে প্রভাবিত করে।

যদি জানতে পারতাম অচিন পাখিটি খাঁচার ঠিক কোথায় বাস করে তাকে ঠিক ধরে ফেলতাম, আর একবার ধরতে পারলেই লালনের ভাষায় ''মন বেড়ি দিতাম পাখির পায়ে''।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

1) Who you are is where you are: Antecedents and consequences of locating the self the brain or the heart. Hajo Adam, Otikia Obadua and Adam Galinsky (2015) Organizational Behavior and Human Decision 128 pp 74-83

2) "The Religion of Love`` Notes of a lecture delivered in London on November 16, 1895, as reported in complete Works of Swami Vivekananda- Vol 8.

3) http://www.bbc.co.uk/ethics/abortion/child/alive1.shtm1

4) https://legiscan.com/AR/bill/ SB134/2013

ওঁ থেকে ও-মারিয়া

সুভাশীষ মুখার্জী, Chicago

আমাদের আধুনিক দৈনন্দিন জীবনে সঙ্গীত (''Music'') ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে গেছে - Thanks to the digital and mobile technology । ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে এখন একটি সাদা (বা কালো) তার দিয়ে তাদেরকে 'জড়িয়ে' রাখে, যার দ্বারা ২৪ ঘন্টা, তাদের কর্ণ পথে, সঙ্গীত প্রবাহ অব্যাহত । কিন্তু এই সঙ্গীতের, বিশেষ ভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের, উৎপত্তি হলো কেমন করে ? কেনই বা তার সৃষ্টি হলো আর কি ভাবে তার বিবর্তন ঘটল, সেটা কিন্তু ওই mobile digital technology evolution-এর থেকেও interesting । তার প্রধান একটা কারণ হলো ভারতীয় সংগীতের দীর্ঘ ইতিহাস — প্রায় ৩৫০০ বছর । আরো একটা কারণ হলো সেই ইতিহাসে আছে নানা রকমের উত্থান, পতন, মিশ্রণ এবং ভাঙ্গন । আছে নানাবিধ প্রসঙ্গ — আধ্যাত্মিক থেকে বিনোদন । এবং সর্বপরি আছে এক অভূতপূর্ব গভীরতা যার মধ্যে অনুভব করা যায় একাধারে নৈসর্গিক, প্রাকৃতিক এবং নানাবিধ ভাবের মূর্ছনা । সেই সংগীতের যাত্রাকে নিয়েই আমার এই প্রবন্ধ ।

সঙ্গীত — ঈশ্বরের উপাসনা

শুরু করা যাক একদম 'শুরুতে' । ''সিন্ধু সভ্যতার'' সময় থেকে, আন্দাজ ২৫০০-১৫০০ BC । সেই সময়ে যে সঙ্গীত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নানা বিধ যন্ত্র (arched or bow-shaped harp, several varieties of drums) এবং মূর্তির মাধ্যমে । আজ সেই সংগীতের না আছে কোনো ছাপ আর না আছে তার কোনো documentation । সময়ের অতলে লুপ্ত হয়ে গেছে সেই সঙ্গীত বৈদিক যুগের আগেই ।

তারপর বৈদিক যুগের সূত্রপাত ১৫০০ BC । শুরু হলো ভারতীয় সংগীতের কাঠামো গঠন । আমরা সবাই জানি যে সংগীতের কাঠামোর মূলে ৩টি উপাদান — কথা, সুর এবং তাল । আবার সুরের রচনা হয় সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি কোমল অথবা তীব্র স্বর ব্যবহার করে । ঋক বেদের স্তবগানে সৃষ্টি হল প্রথম ভারতীয় সঙ্গীত । তবে উল্লেখযোগ্য হলো সেই স্বরগান রচিত হত শুধু মাত্র একটি স্বর দ্বারা কারণ তখন আর ৬টি স্বরের আবিষ্কার হয় নি । তাই স্তবগানকে বলা হয় ''Ek Swari Gaayana'' অর্থাৎ এক স্বরের গান । সেই থেকে ধীরে ধীরে হলো ''Gatha Gaayana'' — দুটি স্বর, ''Saamagaayana'' — তিনটি স্বর । অবশেষে জন্ম নিল সাত স্বরের কাঠামো — স্বরগম । সম এবং যজুর বেদ থেকে শুরু একাধিক স্বরের প্রয়োগ ।

বৈদিক যুগ সংগীতের যে ধারা শুরু করলো সেই সংগীতের শুধু একটিই প্রাসঙ্গিকতা — ঈশ্বর । এই বৃহৎ বিশ্বকে যিনি অবলীলাক্রমে চালাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে । আমি সংস্কৃত জানি না কিন্তু আমার সঙ্গীত গুরুর কাছে শুনেছি যে ভারতীয় সংগীতের মূল আধারকে অভিব্যক্ত করা হয় একটি অপূর্ব উপমার মাধ্যমে — ঈশ্বরকে যেমন আমরা দেখতে পাই না তেমনি সঙ্গীতকেও দেখা যায় না অথচ প্রকৃত ভাবে উপলব্ধি করতে পারলে ঈশ্বর এবং সঙ্গীত উভয়ই যারপরনাই শান্তি দান করে । সঙ্গীত এবং ঈশ্বর-এর এই ওতপ্রোত সম্পর্কই হলো ভারতীয় সংগীতের মূল আধার যেটা সেই বৈদিক যুগের ঋষি মুনিরা আমাদের শিখিয়ে গেছেন আর সংগীতের দ্বারা আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ যে সম্ভব তাও প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন ।

সেই যুগে সঙ্গীত যে শুধুমাত্র গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় । নানাবিধ যন্ত্রও ছিল সেই সময় — তাল ও তন্ত্র বাদনার প্রমাণও আছে যেমন বীণা, তালব দুন্দুভি । স্তবগানের প্রভাত কে উন্নত করতে এই সকল যন্ত্রের প্রয়োগ হত । একটু আগে আমি লিখেছি যে documentation -এর অভাবে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গীত কে আমরা হারিয়েছি । বৈদিক যুগেও যে সঙ্গীতের স্বরলিপি ছিল তা কিন্তু নয় । তবে এইখানেই শুরু হয়েছিল আরো একটি ধারা যা ভারতীয় সংগীতের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট, তা হলো ''aural tradition'' অর্থাৎ মৌখিক দ্বারা শিক্ষা, পরে যা ''গুরু শিষ্য পরম্পরায়'' রূপ নেয় ।

রাগ সঙ্গীত

বৈদিক যুগে যে সংগীতের কাঠামো তৈরী হলো, তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠল পরবর্তী কালের রাগ সংগীতের

কাঠামো। এই কাঠামোতে সুর আর তাল হয়ে উঠল আরো সুসজ্জিত । বিশেষভাবে সুরের দ্বারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক, মানসিক এবং সময়গত অনুভূতিকে নাড়া দেওয়ার receipe তৈরী হলো। তৈরী হলো এক অতি আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক গঠন যাকে বলা হলো ''গ্রাম'' অর্থৎ ৭ টি শুদ্ধ স্বরকে চাপিয়ে তৈরী হলো ২২ টি শ্রুতির octave। সাজ্জা গ্রাম, মাধ্যমা গ্রাম এই দুই মূল octave-এর আধার কে ভিত্তি করে হোলো ১২ টি স্বরস্থান (যেটা আমরা এখন হারমোনিয়াম বা piano তে দেখতে পাই) আর ১০ টি শ্রুতির অস্তিত্ব হোলো ১২টি স্বরস্থানের যে কোনো ২ টি স্বরস্থানের মধ্যে যা শুধু মাত্র sliding musical instrument-এর দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব যেমন সারেঙ্গী, এসরাজ অথবা plucked instrument-এর তারকে bend করে (যাকে বলে মীড়) যেমন সেতার, সুরবাহার ইত্যাদি । বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো যে এই শ্রুতির প্রকৃত প্রয়োগেই রাগ-এর মূল রূপটি ফুটে ওঠে যার দ্বারা সঙ্গীত আমাদের অনুভূতি গুলিকে নাড়া দিতে পারে। এই youtube video টিতে পাঠকরা শ্রুতির একটি সুন্দর demonstration পাবেন —

https://www.youtube.com/watch?v=pqjwyBvLfqM।

এবং এই শ্রুতি কি ভাবে রাগ সংগীতে প্রয়োগ হয় তার demonstration দেখুন আমার এক পুরনো বন্ধু আর fellow musician Praful Kelkar-এর presentation https://youtu.be/DOZP4YrNyko.

সঙ্গীত-দরবার

ধ্রুপদ, যা আধুনিক রাগ সঙ্গীতের পূর্বসুরী, অতি সার্থকভাবে রাগ সঙ্গীত ও বৈদিক সঙ্গীত কে সংযুক্ত করলো। শিব, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনার উপর ভিত্তি করে রচিত হলো নানান পদ যেটা হয়ে গেল ধ্রুপদ = ''ধ্রুব + পদ'' । শুরু হলো এক অভূতপূর্ব সঙ্গীত যাত্রা যা আজও সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন হয়ে যাইনি। ধ্রুপদের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৪০০/১৫০০ সালে গোয়ালীয়ের মান সিং তোমার এবং সম্রাট আকবর এর দরবারে এবং তখন থেকে গত ৫ হাজার বছর ধরে গুরু শিষ্য পরম্পরায় এই সঙ্গীত আজও বেঁচে আছে। কয়েকটি ''ঘরাণা'' যাকে বলা যেতে পারে ''ঘর'' বা family এই সঙ্গীতকে বিশ্ববরেণ্য করে তুলল। এর মধ্যে উল্লেখ্য হলো ''ডাগর'' ঘরানা। মুসলমান ধর্ম প্রধান এই ঘরে রচিত হতে লাগলো হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা মুলক গীতি। আজকের এই যুগে যখন আমরা নিজেদেরকে global citizen বলে বড়াই করি কিন্তু ধর্মভেদকে ভেদ করতে পারি না, ধ্রুপদের এই বিস্ময়কর উদাহরণ খুবই প্রাসঙ্গিক। তাই নয় কি ? ধ্রুপদ মূলত পরিবেশিত হত যুগলবন্দীতে এবং ডাগর বংশের কয়েক প্রজন্ম আমাদের এই সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন । ডাগর ঘরাণা ছাড়া আছে দারভাঙ্গার মল্লিক ঘরাণা, মিশ্র ঘরাণা এবং আমাদের বাংলার বিষ্ণুপুর ঘরাণা ।

ধ্রুপদাঙ্গের যন্ত্র হলো বীণা এবং পাখোয়াজ । নানাবিধ বীনায় যেমন রুদ্রবীণা বিচিত্রবীণা সরস্বতীবীণা ইত্যাদিতে ধ্রুপদের গম্ভীর সুর ও মূর্ছনাকে পরিবেশন করা হত। আর তালবাদ্য বলতে পাখোয়াজ । ধ্রুপদের গম্ভীরতাকে সাথ দেবার জন্য পাখোয়াজে তৈরী হল জটিল তালের কাঠামো। ১০ মাত্রার সুলতাল, ১২ মাত্রার চৌতাল, ১৪ মাত্রার ধামার এবং ২৮ মাত্রার ব্রহ্মতাল হলো তার কিছু উদাহরণ। এই সকল তালের ওপর নানান composition, বিভিন্ন ঘরাণা আর গুরু শিষ্য পরম্পরায় আজও বেঁচে আছে । যদিও অনেক তাল আর composition কালের অতলে তলিয়ে গেছে যথার্থ্য পৃষ্ঠপোষকতা, শিক্ষা ও শ্রোতার অভাবে।

খেয়াল

মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে নিয়ে আসে পারস্য সংগীতের প্রভাব। সেই সঙ্গীত এর সাথে ভারতীয় সঙ্গীতের মিশ্রণে জন্ম নিল খেয়াল। এই মিশ্রণের প্রধান কারিগর হলেন আমির খুস্রু, যিনি আলাউদ্দিন খলজির সমসাময়িক অর্থাৎ ১২০০-১৩০০ সাল। তিনি তৈরী করলেন সেতার (''সেহ'' — তার মানে আরবী তে তিন তার), তবলা এবং জন্ম দিলেন খেয়াল গানের । খেয়াল এর কাঠামো ওই ২২টি শ্রুতির ওপরেই তৈরী হলেও, তা ধ্রুপদের তুলনায় হালকা ছিল। যার জন্য আমির খুস্রু পাখোয়াজ ভেঙে তৈরী করলেন তবলা এবং এই সেতার ও তবলা তার লেখা বিভিন্ন composition -এ বাজানো হত । অর্থাৎ তৎকালীন যুগে খেয়াল ছিল contemporary আর ধ্রুপদ ছিল classical সঙ্গীত।

তবে আধুনিক খেয়ালের জন্ম আরও অনেক পরে ১৭০০ সালে, বাহাদুর শাহর নাতি মুহাম্মদ শাহ-এর আমলে। এই খেয়াল গানের জনক হলেন সদারাং এবং তার ভাইপো আদারাং।

সঙ্গীত — সমাজ ও সাধারণ মানুষ

সঙ্গীত, যার স্থান ছিল উপাসনালয় বা দরবারে, তা ধীরে

ধীরে ছড়িয়ে পড়লো সাধারণ মানুষের মধ্যে। জন্ম নিল চলিত ভাষায় লিখিত এবং উপজাতীয় সঙ্গীতের ভিত্তিতে রচিত লোকসঙ্গীত। ভারতের নানা ভাগে নানা ভাষায় এবং নানা সুরে লোকসঙ্গীতের প্রভাব সাধারণ মানুষকে ভাসিয়ে দিল। রাজস্থান থেকে পশ্চিম বাংলা এবং কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ মধ্য ভারতে তৈরী হল নানান তাল ও ছন্দ। এই তাল ও ছন্দ মূলত ৬, ৭ বা ৮ মাত্রার, অর্থাৎ অনেকটা সংক্ষিপ্ত এবং সহজ। লোক গীতির পাশাপাশি জন্ম নিল ভক্তি গীতি। উপাসনামূলক গায়ন এর সঙ্গে এই সঙ্গীতের দুটি বড় তফাৎ — এক হলো এই গানের বিষয় হত মূলত ধর্ম বা কোনো নির্দিষ্ট দেব দেবী এবং তার ভাষা — সংস্কৃত না হয়ে আঞ্চলিক ভাষা। বাংলার কীর্তন তথা অন্যান্য লোক সঙ্গীত এবং ভক্তি গীতির ওপর রাগ সঙ্গীতের ছায়া ভীষণ ভাবে দেখা যায়।

সঙ্গীত-বিনোদন ও চেতনা

এরপর এল সময় যখন সঙ্গীত শুধুমাত্র অন্তর্বর্ত্তী আনন্দ সন্ধান-এর মধ্যে আর সীমাবদ্ধ রইলো না। সঙ্গীতের মধ্যে মানুষ বিনোদনের রাস্তা পেল। দরবারী ও সামাজিক, দুই প্রেক্ষাপটেই সঙ্গীত হয়ে উঠল জনপ্রিয়। তবে এই সঙ্গীত কিন্তু ছিল রাগাশ্রয়ী। যেমন ঠুমরী, দাদরা ও গজল হয়ে উঠল দরবার ভিত্তিক বিনোদন সঙ্গীত, তেমনি কাজরী, চৈতী, হরি, সাওনি ইত্যাদি হয়ে উঠল সামাজিক বিনোদনের উপায়।

এরপরে এল যাকে আমরা বাঙালিরা সোজা সাপ্টা ভাষায় বলি ‘‘গান’’। অর্থাৎ কবিতা যা সুরারোপিত হয়ে পরিবেশিত হতে লাগলো। কবিতার ভাষা প্রাথমিকভাবে হিন্দি, উর্দূ অথবা আঞ্চলিক এবং তার সুর হল রাগ ভিত্তিক অথবা নানান সঙ্গীতের মিশ্রণ-লোকগীতি, পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের নিজস্ব কোনো পরিচয় (identity) না থাকলেও এর জনপ্রিয়তা exponentially বাড়তে থাকে এবং সঙ্গীতের জগতে আরেকবার বিপ্লব আসতে শুরু করে।

বিংশ শতাব্দী শুরু হলো সঙ্গীতের নতুন ধারাকে নিয়ে। বাংলা সঙ্গীতের জগৎ হয়ে উঠল সমৃদ্ধশালী। কবিগুরু, কাজী, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও আরও সব সনামধন্য কবি ও গীতিকার বাংলার সঙ্গীতের আকাশকে করে তুলল তারকাক্ষচিত। এই গানই হয়ে উঠল সামাজিক চেতনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল medium।

সঙ্গীত-শিল্প ও ব্যবসা

৩৫০০ বছর ধরে ‘‘হাঁটিহাঁটি পা পা’’ করতে করতে ভারতীয় সঙ্গীত এসে পৌছল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। আধুনিক গান, চিত্র গীতি হয়ে উঠল শিল্প। সঙ্গীত হলো commodity। শুরু হলো সঙ্গীতের কেনা বেচা। Industry, technology, mass production এবং নানাবিধ ডিস্ট্রিবিউশন মিডিয়া Record, Tape, CD। এল cinema তৈরী হলো বলিউড ও নানান আঞ্চলিক চিত্র তৈরী করার কারখানা। জন্ম নিল সঙ্গীতকে ঘিরে নানাবিধ নূতন পেশা- lyricist, music director, arranger, sound recordist, sound engineer ইত্যাদি। এল সঙ্গীতের economics- চাহিদা এবং সরবারহ। ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে মিশ্রিত হতে লাগলো পাশ্চাত্য সঙ্গীত। প্রথমে শুরু কিছু কিছু পাশ্চাত্য instrument-এর ব্যবহার। তার পর হলো পাশ্চাত্য সুর ও তালের ব্যবহার। এবং বিংশ শতাব্দীর অবশেষে ব্যাপারটা খানিকটা উল্টো রূপ ধারণ করতে শুরু করল। অর্থাৎ পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রধান একটা কাঠামো। তার উপর ভারতীয় ভাষায় লেখা lyrics। জন্ম নিল আরেকটি সঙ্গীতের ধারা বাংলা ব্যান্ড।

আমার লেখা এবার শেষ করব। শেষ করার আগে কিছু কথা, যা একান্তই আমার অনুভূতি। সঙ্গীত এমন একটি দান যা সময়, ধর্ম, সমাজ, জাতি বা ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে আটকে রাখা যায় না। তাই প্রকৃত সঙ্গীতের ভাষা Universal, আর প্রকৃত সঙ্গীত হলো সেটাই যা মানুষের অন্তরকে ছুঁতে পারে স্থান, কাল ও ভাষা নির্বিশেষে। আর যেহেতু মানুষের অন্তরেই ঈশ্বর বিরাজমান, তাই সঙ্গীতই হলো ঈশ্বর কে অনুভব করার একমাত্র উপায়। Music is Divine.

References

http://www.itcsra.org/sra_hcm/sra_hcm_chrono/sra_hcm_chrono_index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Indian_history

https://en.wikipedia.org/wiki/Dhrupad

http://www.sathya.org.uk/resources/books/history%20of%20music/Vedic.php

The Redbud

Jill Charles, Chicago

Pink blossoms light up
Their brown March branches
Like the promise of the rainbow
To illuminate these woods:
Wake robin, tiger lily, buttercup,
Jack-in-the-pulpit, bluebell and marsh violet.

When the oak and maple shivered bare
And noble firs went white with frost
We almost forgot the colors
Under gray snow and treacherous ice
And surrendered to our long shadows.

But the redbud remembered
On its branch of icicles.
It knew that grief can melt
In healing tears
Like raindrops nurse the roots
And exhale in bright pink petals
Every spring the redbud returns
Gentle and fearless as love.

Albany Park

Jill Charles, Chicago

I can't afford to leave here.
Kids ride bikes on the sidewalk
And uncles play poker in the garages.
A junk truck rattles up the alley
Like a plywood and rust dragon
Gobbling up scrap metal.

Songs drift over Kedzie Avenue:
A hymn from the Phillipines
Persian love songs from lilac gardens
A marching anthem from El Salvador.

We all belong here
Like the trees by the river
Native oak
Swedish linden
Russian olive
Japanese maple
Seeds dropped in from everywhere
By the Chicago wind.

I have made my home here
In a pumpkin-colored kitchen
Behind yellow brick walls
Outlasting another Depression
I can afford to stay here
In Albany Park.

The Wind Pipe

Abhijit Mukherjee, Perth, Australia

I did not cry at the moment of my birth. The deluge came after a few slaps from the rather well built doctor friend of my father, and it never stopped. The members of my mom's family tried all their tricks to pacify me, without result. At that time my uncle who had taken inspiration from the legendary Gangaram and had strengthened the pillars of succeeding in matriculate examination through nine successive attempts was preparing for the tenth time. I or my incessant music became the raison d'etre for the tenth time and in his wrath he named me Bhenpu (a trumpet made of palm leaves that the children got whenever they visited a village fair and never stopped blowing at it until an elder broke it in anger). The name sticks to me even today.

As I grew up, the embarrassment due to the nickname also grew. The name reached my school before I could set my foot into its premises. I came back, wailing as usual, and refused to go back to school again. Only one of my dad's bed time stories could persuade me back to school…

There was a demon princess in the distant *Demonland*. She was fair as she was pretty. Her parents named her Rupshayori (the lake of beauty). One day, Rupshayori came out with her best dress on to go to a dance party with the prince of *Giniland*. All was nice and all was fair. From nowhere came a naughty cloud and squirted a few drops of rain on her. The rain spoilt the dress and the mood of the princess. She threw an angry look at the cloud, took a deep breath and puffed at the cloud. This was no ordinary anger! It created such a storm that it reached the skies and all the clouds came down in rains. The clouds could do nothing with all their thunders. From then on out went the blow whenever she saw a cloud and down came the rains. There were very few clouds left in the sky floating uneasily to avoid the *Demonland*.

Once the clouds met on an island called Mumbai (that's where I lived at that time) to find a way to stop the princess. There lived a little boy, Bhenpu, with a magic trumpet. Whenever he played the trumpet every listener would stand still. When he heard that the clouds were conspiring to kill the princess he offered to go with the clouds. “May be, with my trumpet, I shall be able to stop the princess to blow at you”, he said. An adventure trip riding the clouds to the land of the demon princess! He loves nothing better.

As the clouds drew cautiously to the Demonland out came the princess like a cheetah and took a very deep breath in. Just then reached the tune of Bhenpu's magic trumpet the princess' ears. It was the lullaby Bhenpu's mother sang every night. The princess' eyes closed and she fell asleep.

All the clouds came down and swooped the princess up high in the sky. The waves of the deepest ocean were hissing below to gulp her down. “Halt” said Bhenpu, “Don't throw her in the ocean. I shall ask her not to blow at you and she will obey.” The clouds were in no mood to listen but the oldest of them with the longest flowing white beard said, “Look, at her!” Two pearls of tears were glittering on the long eyelashes of Rupshayari. The clouds looked back at Bhenpu.

As the clouds put the princess back on ground her eyes opened up with a curious look of delving in bliss. “Please take me to the musician who plays such sweet tunes! I have never slept so peacefully in my life.” Bhenpu played a dance tune in Raag Bahar. Rupshayari remained transfixed only her little head started swinging in the beat of the music. She prayed “Will you please be my guru and teach me music?” Bhenpu said, “Gladly, but for a fee!” “Any fee you would like. All my fathers treasures are for you”. “I only ask the life of the clouds as *gurudakshina*.” The princess lowered her gaze with a shy nod that rippled in her beautiful tresses. The clouds performed a rain dance around the two of them with Bhenpu's music and Rupshayari's dance.

Even today when the epidemics strike, wars destroy or violence breaks out I instinctively reach for the elusive magic trumpet to give the healing touch of a rain dance. From heaven the stars twinkle, like dad smiled so long ago.

"তবু তুমি নেই"

সুপর্ণা চ্যাটার্জী, Perth, Australia

তবুও আজ
"আম হিজলের বনে জ্যোৎস্না এসেছিলো
স্বর্ণলতা সূর্য উঠল পুব ঘেঁসে সেই
সোনালী চিলের ডানায় সন্ধ্যা এল ফের
তারার আকাশে নির্লজ্জ চাঁদ
হেসে, উপহার দিল আরো একটা রাত ।

সোল দিঘির জলে ডাহুক পাখী
পাশে ঘুরছে কাদাখোঁচা মাছ রাঙা
শীতের চাদর ছড়িয়ে তবু ও
পাচ্ছি ঠান্ডা হাওয়া, সেই ।
ঝিঁঝিঁর ডাকে বুঝি,
সন্ধ্যা এল ফের ।

নরম ভেজা অনেক দিনের জমানো স্মৃতি
মাছ রাঙার ঠোঁটের ধারে ধরা
হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখি বার বার
বুদ্ধ, খৃষ্ট Da Vinci-র পটে আঁকা
মোহময়ী Monalisa
সময়ের তুলিতে বদলেছে রঙ ।
হঠাৎ মনে হলো, ওরা সব
কাছের বড়ো আজ
Monalisa-র চোখে দেখি কোমলতার ছোঁয়া,
তার বাঁকা হাসিতে পেলব মাটির টান ।

জীবনের ঝড়ে, জানি ঝরে যাব সেই
তবুত অনেক না ঘুমের ভোর
না বলা কথার তার
আর সবুজ মাঠে জীবনের রঙ,
এ সব না পাওয়ার হিসেব
রাতের Swan এর ধারে রেখেছি তুলে,
যত্নে, আদরে, অভিমানের বাষ্পে ভেজা
এক রাস স্মৃতির কথা ।

ভেবেছি তুমি একা,
তোমাকে ভালবাসবে কে সেখানে ?
বুকে ধরে রেখে,
যত্নে, পাটে, চুল টান টান ?
সৃষ্টির আহ্বানে দেবে কি তবে সাড়া ?
প্রশ্নটা ঘুরছে, হাওয়ার হাত ধরে
সমুদ্রের সাথে, ঢেউ হয়ে
আছড়ে পড়ছে বার বার
সাদা ফেনা হয়ে
হলুদ বালির সাথে মিশে
একাকার ।

প্রশ্ন আবার সেই
সৃষ্টির আহ্বানে
দেবে কি তবে সাড়া ?
চিনে নেবো, রইল অঙ্গীকার
শতাব্দীর সীমানায়
প্রতিশ্রুতি তোমাকে আমার ।

I Will Rescue You

Jill Charles, Chicago

I saw Alan today. I stopped at the red light at Maple Street. He stood there, in a black leather jacket, the Spokane I-90 freeway roaring behind him. His hazel eyes lit up when he saw me and his lips moved as if about to speak.

I was late to work, but I tried to pull over when the light changed. I looked back at the sidewalk to find Alan gone. It has been 27 years since I last saw him.

* * *

I met Alan Blake in sixth grade at Jefferson Elementary. He joined our class in October. No one smiled, waved or made room for him when Mr. Jared said "This is Alan, a new student who will be joining our class."

Alan sat next to me. He had fuzzy ash blond hair, a Super Mario t-shirt and faded jeans. We worked quietly on our long division. At the bottom of his worksheet he drew a giant squid attacking a pirate ship.

"Is that the kraken?" I asked.

"You know what the kraken is?"

He looked impressed.

"Yes, giant squids are my favorite animal. I know the kraken's not real, but giant squids are a lot like it. My name's Melissa Devlin. That's a really cool picture."

"Thank you, Melissa."

At recess Alan started playing tetherball alone. I walked up and whacked the yellow ball, its chain clinking against the pole. We played all recess without saying a word.

At lunch Alan only had a peanut butter sandwich so I gave him half of my carrots and fruit snacks.

"I have something for you too," he said. "Cover your eyes and hold out your hand."

I heard a rustling sound and felt something light in my hand.

Alan had twisted my school lunch napkin into a squid with eight short arms,two long tentacles, a big conical head and yellow fruit snacks for eyes.

"It's your own kraken," he said. "He will guard your lunch."

* * *

When I saw Alan on the street, as a thirty-nine-year-old social worker, I couldn't stop even for a minute to look for him. I rushed downtown to meet Crystal, a foster care graduate, for career planning.

"Sorry I'm late. Let's look at some classes," I said, opening a Spokane Community College course book.

* * *

I asked Alan to go trick-or-treating with me. Our parents would let us go without an adult as long as we stayed together and didn't cross 29th Avenue.

I was a scarecrow waiting at Alan's door. Pine needles covered the patchy grass and the porch light was burned out.

I buzzed the doorbell, but no one answered. I pounded the door, a cacophony of knuckles on wood.

Inside, a man's voice screamed "Shut the hell up!""

I tried the lighted back door.

Alan and his mother stood at the kitchen sink. He wore a white sheet wrapped around him and hooded over his head. His mom pinned it under his chin, careful not to smudge his white make-up. Alan saw me at the door and opened it.

"Hi," he said. "This is my mom, Alice Blake. Mom, this is Melissa"

"It's nice to meet you," said Mrs. Blake, shaking my hand. She had bright hazel eyes, like Alan, in a tired but gentle face.

From the living room, Alan's dad bellowed "You kids better be back before nine."

"I have a watch," I volunteered. "I'll bring Alan back by nine and we won't cross 29th."

Alan's dad sat in the dark, silhouetted in the blue glow of the TV. He lifted a brown beer bottle to his lips and never turned to look at us.

"You kids have fun," said Mrs. Blake, patting Alan's shoulder.

"Thank you, Mom," said Alan.

I didn't say anything about his dad.

At school when Ryan and Lance threw Alan's hat on the roof, he said "My dad's going to kill me."

He said that about a lot of things, flunking a math test, losing a spelling paper, getting in trouble for drawing cartoons instead of taking notes.

"We're twelve years old," Alan said. "This is our last Halloween to rake in the free candy before we mutate into teenagers. Let's make the most of it."

"I like your costume," I said.

"Thanks. Almost no one goes as a ghost anymore. It's just my old sheet and Mom's cold cream and talcum powder."

We collected at least a pound each of fun-size candy bars, caramels, licorice whips, bubble gum, peppermints, taffy and candy corn. We had a great time until Ryan and Lance

spotted us across the street. They were dressed as skeleton ninjas but we recognized their idiot voices.

"I'm gonna blow my nose in your sheet, Alan!" Ryan said.

"Come on over! We're not scared of you!" we yelled.

"Get them!" Lance snarled.

They started to cross the street, but a car came.

I led Alan down the alley, behind a woodpile in my neighbor's backyard. We held still, barely breathing with dread. The air smelled like pitch and woodsmoke. Lance and Ryan's footsteps crunched on gravel.

"We'll find you, Alan! We'll burn your scarecrow and make you a ghost for real!"

Across the alley, a German shepherd lunged at the fence, barking and snarling.

Ryan screamed, then said "This sucks. Let's go smash some pumpkins."

In the dark, where no one could see, I held Alan's hand.

* * *

At 5:45pm, I still slouched at my office desk, typing a Washington state agency report. My husband Glen walked in smiling.

"Surprise! I tried to call but you didn't pick up," he said. "Guess who won ballet tickets from the radio?"

I hugged Glen and kissed him, but he read the worry in my eyes.

"What's wrong, Melissa? Is it one of your clients?"

I never breached confidentiality but sometimes I had to unburden myself by telling Glen about a client's problems and our attempts to solve them, never mentioning their names.

"It's something else, Glen," I said. "I saw Alan Blake today by the freeway entrance on Maple."

"Are you sure it was him? He must be around forty now and probably looks a lot different than when you saw him last."

I shook my head.

"It was Alan, but he wasn't any older. He tried to talk to me and I pulled the car over, but when I looked up he was gone."

"You know that's impossible. It must have been somebody else who looked like Alan, maybe a son."

"He had no son. It was Alan, just like he looked back then. What was he trying to tell me?"

* * *

In June, I invited all my sixth grade friends to my birthday party at Comstock Park. The pool opened the day after school closed.

"We can all ride our bikes to the park," I told Alan. "Then we can swim until five o'clock and my mom will bring hamburgers and hotdogs to grill."

He blushed and shut his eyes tight, trying not to cry. Finally he spoke.

"I'm sorry, Melissa. I can't go. My dad got a new job in Richland."

Had Alan known this for a while and not wanted to tell me?

"Do you have to move?" I asked, stupefied.

"Yes. I don't want to go. We're leaving on Saturday."

At recess he felt too sad to play tetherball and just leaned against the school wall.

On the last day of school, the day before Alan would leave, I asked Mom and Dad if I could ride my bike after dinner. I rode straight over to his house.

In front of Alan's house, his dad's pick-up truck sat piled high with cardboard boxes. Inside, his parents argued so loudly you could hear them across the street. I ignored them and crept around the back, finding the kitchen door unlocked.

I tiptoed upstairs to Alan's room. I knocked on the door and he was so surprised, he jumped.

"Melissa, what are you doing here?"

"I missed you already. Can you come to the playground for a little bit?"

"Yes. Let's get out of here before Dad makes me move more boxes."

He grabbed his bike from the garage and we took off.

No kids were on the Jefferson playground. We parked our bikes by the three-story orange fire escape we were never allowed to climb at recess. We climbed to the top and stood on the small metal balcony looking out over the schoolyard, Hart Field beyond it with its track and football goals, all the pale houses and dark pine trees. The sun hung low in the sky like a lemon slice in pink lemonade.

I wanted to keep Alan safe, in a place where friends surrounded him and bullies couldn't touch him. He reached over to hold my hand. We hadn't held hands since Halloween, never wanting anyone to joke that we were boyfriend and girlfriend.

We turned toward each other, slowly hugged and then closed our eyes and kissed. I'd never kissed anybody like that, like in a movie or a fairy tale. My heart raced and I felt like a soda pop bottle with bubbles rising. I tried to smile and say something meaningful.

"Alan, I like you so much. You're a great friend and more than a friend and I wish I could rescue you."

"I'll be okay, Melissa," he said. "I'll write you. One day I'll come back and rescue you. I promise."

When we rode back to his house, Alan hugged me one more time and managed not to cry before running into the house.

He did write me a few letters. He made friends in Richland but his dad stayed mean, even with the new job. I wrote him every week all summer but in seventh grade Alan and I both slowly stopped writing. By the time I started high school, Alan had faded to a bittersweet memory.

As a grown-up social worker, I keep one file in my drawer behind my clients' lists of goals, new resumes and college application essays. In it is an obituary from the *Spokesman Review*. Alan smiles up from it in black and white, with a leather jacket and the same flyaway hair. A friend of his had been driving drunk. His mother and father asked for donations to Mothers Against Drunk Driving instead of flowers. He had only been nineteen.

Glen thought I had hallucinated when I saw Alan all those years later. He never believed in ghosts or souls and he didn't like me to talk about it. I managed to pave over the memory as we watched the ballet dancers leap like white cherry blossoms, as we ate crab and drank zinfandel, as I settled into sleep in Glen's arms.

One week later, I saw Alan again.

He stood alone on the same corner and beckoned to me with one hand.

I pulled over, glancing down at the wheel and braking. Then I felt something slam into my car. I screamed, took off my seat belt and scrambled out the passenger side door. A brown truck had run a red light and crashed into my car. The driver was bleeding and moaning. I called 9-1-1 on my cell phone. If I had not pulled over that minute, the truck would have hit me head on and crushed both me and the other driver. The paramedics rushed him to Sacred Heart with a concussion and broken bones but he would recover.

Alan had warned me about that corner. He had kept his promise. My friend who I could never rescue had saved me.

I whispered "Thank you, Alan."

The Roadside Weaver

Indrani Mondal, Chicago

A colorful patchwork shawl thrown over thin shoulders
he sits there on the pavement,
flagstones chipped with age
weeds nudging their sharp, unruly elbows in between
slivers of dusty green in the worn, fissured granite,
in straight backed, crosslegged ease hour after hour on a torn sack,
a modern Buddha in stance and profile,
fingers endlessly in motion
weaving and threading
stone upon stone, bead after bead
some real, some look alike
all equally precious to the eager wearers
waiting patiently (or not) all around
watching avidly
as those adroit fingers, scarred dark with constant thread friction,
bring form and shape
to every loose anarchy of jingling color and spilled sparkle,
stringing row upon row
of neat bind
to hold a neck maybe or a wrist
with grace, glitter and symmetry;
birds come to roost with a flap of wings and strewn feathers
in the overhanging peepul tree
sharing loud chirps of their day's adventures
over the din of vehicles of all shapes and sizes driving by
in a cacophony of horn blasts, screeching brakes and belching exhausts.
None of the sounds and smells interfere with
the weaver's incessant bead play
telling tales of style after style in rhythms galore
quiet, calm, effortless…
almost as mesmerizing as the tapestry of our lives
being woven incessantly by an artist
more dexterous, swift and articulate than we .
Thus I sit on my wobbly tin stool
balancing a tiny overheated terracotta cup of
over sweet tea in my wriggly fingers
trying to make sense
of this endless quiet creation of pattern
inthe surrounding chaos of distracting noises while night falls..
groping yet to find my homecoming
in such relics of my forsaken childhood.

The Street Venders

Indrani Mondal, Chicago

Amidst the daily evening crowds

Jostling to get home in street dust and fumes,

the crammed street venders spill all along the uneven pavements

flaunting their wares in unabashed abandon,

from bewitching eateries;

serving piping hot savory onion fritters

gurgling and spluttering in the murky hot oil of giant cauldrons,

brick red skewered kebabs

smoking in blazing make shift pits,

or flatbreads with a cracked egg on top

fried to pungent perfection then rolled with chopped salad

plump lentil stuffed pitas dipped in spicy potato curry,

along with the ubiquitous tiny terracotta cup of sweet milky tea;

to sculpture stalls of sedate clay images of Gods and Goddesses

with intricate colorful adornments,

useful household tools, keys, almanacs

to binding and restoring old manuscripts,

junk jewelry from scarps of metal, wood and stone

ingeniously strung for every size, shape and taste,

colors, flavors, smells

gone wild in ad hoc frenzy,

as I run into bustling bodies just by standing to admire,

a common risk here taken in stride,

but for me

a wonder at every step

a discovery at every turn

a gasp, a choke, a stumble

ending nevertheless in an unexpected chuckle often

at the marvel of assertive life,

a pang of guilt sometimes or an unshed tear

at the unabated flow of talent

so cheaply spent, so easily squandered,

from the gnarled sculptor, the talkative painter,

the prayerful weaver, the wise book binder

the sprinting cartoon street actor

to the innovative boy cook,

all unsung heroes of their evolving destinies every day,

an encounter with awe even reverence for me

at this coming face to face with so many palpable hungers

some alien and remote maybe

but incredibly resonant even now

this sheer thrust for survival

that manages to fire, mold and define

my loves and hates

move the tectonic plates of my world

so many decades and latitudes away.

লিমেরিক

শুভ্র দত্ত, Washington, USA

শীতের রাতে হোজ্জাসাহেব ঘুমোন খাটে চড়ে
হঠাৎ সবাই শুনলো আওয়াজ সেথায় ধপাস করে
হোজ্জা চেঁচান, হয়নি কিছুই
জোব্বা আমার পড়লো শুধুই
(অবশ্য সেই জামার ভিতর আমিও ছিলাম ভরে) ।

****

চন্দ্রগুপ্ত বাঁ পকেটে, ডানদিকে শশাঙ্ক
বুকপকেটে হর্ষ, এবার হিস্ট্রিতে নিঃশঙ্ক
হিপ্‌পকেটে বাবর
শের শা’ এবং আকবর
পৌঁছে হল্-এ, হায় কি ভুল এ, নয় ইতিহাস, অংক ।

****

অফ্-হোয়াইট টপ-কোটেতে চলেন পথে দাদা
মাথায় ধরেন লেদার-ব্রাউন সদ্য কেনা ছাতা
বৃষ্টি নামে জোরে
পৌঁছে দেখেন দোরে
জামাটি তাঁর খয়ের গোলা, ছাতাটি প্রায় সাদা ।

****

জ্ঞানেশ জানা ভালবাসেন জ্ঞানের জিনিস জানতে
দূরবীনেতে চোখ লাগিয়ে দূরকে কাছে আনতে
নজর রেখে দূরের চাঁদে
হাঁটতে গিয়ে পড়েন খাদে
নিজের গ্রহে এ দুর্গ্রহ, যায় না পারা মানতে ।

‘বেলাশেষে’

সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, Perth, Australia

এক অসাধারণ ছবি হবার সম্ভাবনাই ছিল —

পরিচালক : শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়

অভিনয়ে : সৌমিত্র, স্বাতীলেখা, ঋতুপর্ণা, খরাজ, শঙ্কর প্রমুখ।

এই ছবি নিঃসন্দেহে এক অন্যধারার এবং ভিন্ন স্বাদের ছবি । ছবির মূল গল্প এরকম যে — মজুমদার বাবু এক সফল পুস্তক ব্যবসায়ী, জীবনে শেষ অধ্যায়ে, তার বিবাহীত জীবনের উনপঞ্চাশ বছরে পৌঁছে উপলব্ধি করেন তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করা প্রয়োজন । এবং বাড়ির পুজোর দশমীর পরে তার ছেলেমেয়ে, বৌমা এবং জামাইদের ডেকে তার বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন । বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার বিচারক মহাশয়ের পরামর্শমতো মজুমদার বাবু সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যান । যদিও তার স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে পুরো পরিবারই তাদের সঙ্গে যোগ দেয় । সেখানে সন্তান, বৌমা ও জামাইরা গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে মজুমদার বাবু এবং তার স্ত্রীর কথোপকথোন শোনেন । মজুমদার বাবু প্রধানত এই বিবাহ বিচ্ছেদের মূল কারণ হিসাবে তিনি তার স্ত্রীকে স্বাবলম্বী করতে চান সেকথা জানান । সারা জীবন ধরে তিনি তার স্ত্রীকে ‘তেমনভাবে পান নি, সেকথাও বলেন ।’ এও বলেন যে তিনি এখন একা থাকতে চান । কারণ তার অনেক দেখার শখ, ইত্যাদি ইত্যাদি । স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কলকাতা ফিরে আসে, কিন্তু মজুমদার বাবু এবং তার বিশ্বস্ত চাকর ফেরে না । চারমাস পরে মজুমদার বাবুর আত্মউপলব্ধি হয় যে তিনি আর একা থাকতে পারছেন না । এদিকে তার স্ত্রী কিন্তু এতদিনে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন ।

শেষ দৃশ্যে মজুমদার দম্পতির কিছু চোখা চোখা সংলাপ আমরা শুনি । মজুমদার দম্পতির পঞ্চাশ বছর বিবাহ বার্ষিকী পুর্তির এ্যালবামের ছবি আমরা দেখতে পাই । এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার বিচারক মহাশয় কে উপহার সহ অতিথি হিসাবে দেখা যায় ।

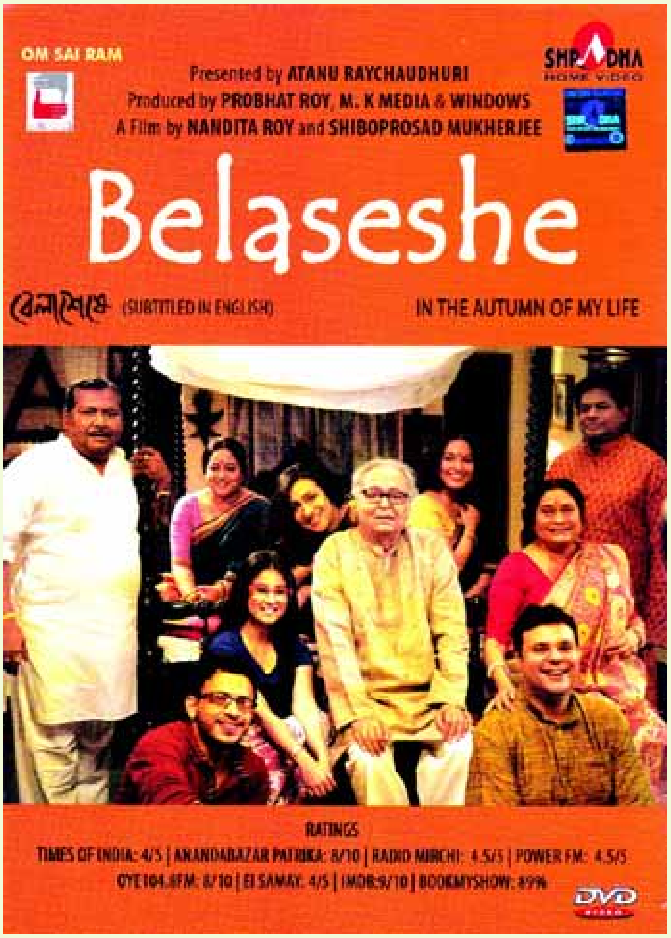

ছবিটির বিষয়ের অভিনবত্ব ছিল । কিন্তু অতি সরলকরণের জন্য সেই অভিনবত্ব হারিয়ে আর পাঁচটা ছবির মতো এই ছবিও আমার কাছে একটি সাধারণ ছবি হয়ে ওঠে । যদিও কিছু কিছু দৃশ্য, যেমন সোনাঝুরির পাতাঝরার দৃশ্য, মেলার দৃশ্য বড় মনোরম । ছবি কিছু কিছু সংলাপ আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে ।

যখন বড় বৌমা বলে যে একদিন সে পূর্ণিমার রাতে কোপাই নদীর ধারে যেতে চায় ।

যখন মজুমদার বাবু তার স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন ‘‘প্রেম না অভ্যেস ? আমি তোমাকে কতটুকু পেলাম ?’’

শেষ দৃশ্যে যখন মজুমদার বাবু তার স্ত্রীকে বলেন ‘‘তুমি স্বাবলম্বী হয়েছো, আমি পারি নি তুমি আমার জীবনের লেখক ।’’

এই দৃশ্যগুলি আমাকে ভীষণ নাড়া দেয় । ভাল লাগে যখন এস্রাজের সুরে ভেসে ওঠে ‘‘তুমি রবে নীরবে . . .’’

অভিনয় এই ছবিটির শ্রেষ্ঠ সম্পদ ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার মতে ভারতবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা । উনি অসাধারণ দক্ষতার সাথে মজুমদার বাবুর চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

ওনার অভিব্যক্তি আমাদের ভাবিয়েছে । ওনার হাঁটাচলা, বসে থাকা, সংলাপ বলা সবকিছুই অন্য মাপের, ওনার মজুমদার বাবুর চরিত্রায়ন আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে ।

স্বাতীলেখার অভিনয় দর্শকদের মন কাড়বে ।

জামাই-এর ভুমিকায় খরাজ মুখোপাধ্যায় এককথায় অনবদ্য । ঋতুপর্ণা, শঙ্কর ও অপরাজিতাও তাদের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করেছেন । ছবিটি কয়েকটা দৃশ্য বেশ সাজানো লেগেছে যেমন বিচার কক্ষ বিচারক মহাশয় তিনি জীবন দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন — অবাস্তব । সোহিনীর চরিত্রটার কোন প্রয়োজন ছিল না । বেশ আরোপিত এবং কৃত্তিম লেগেছে ।

ছবির শেষে যখন ছবিটিকে নিয়ে যত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে এ ছবিটি কি এক অন্য মাত্রার ছবি হিসাবে গণ্য করা যায় না । আমার মনে হয় তার প্রধান কারণ বাস্তবতার অভাব ।

বিশেষ করে ছবির শেষটা এতটাই সাধারণ মাপের যে ছবিটিকে অন্য জাতের ছবি হিসাবে চিহ্নিত হতে দিল না । যদিও ছবিটি উপভোগ্য এবং নতুন বিষয়ের কিন্তু বিষয়টা কে আমাদের মনে গভীরে গিয়ে নাড়া দিতে ব্যর্থ হলো ।

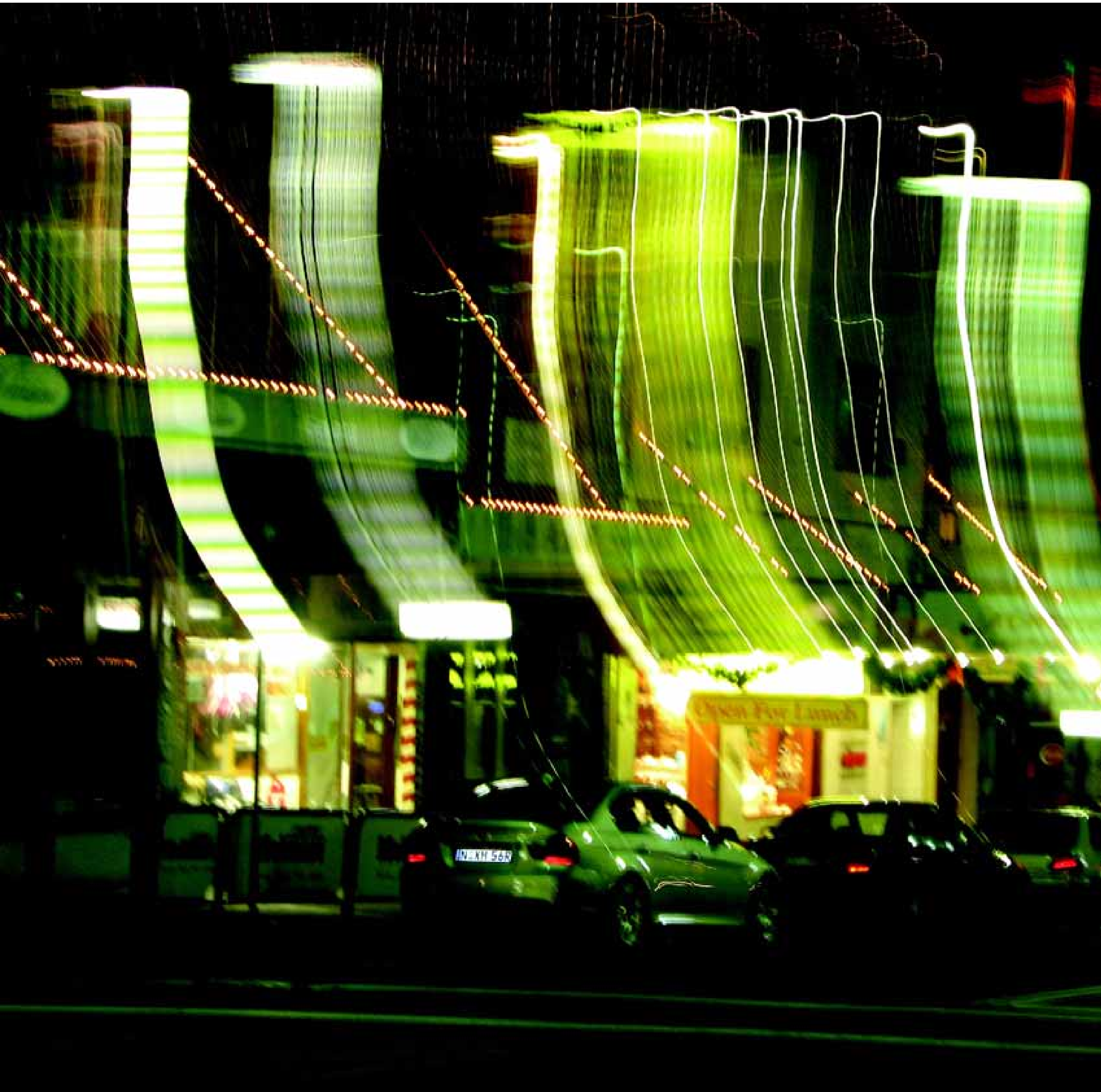

Greetings for 2016

— Wishing you all a year of light and hope

Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness.
— Desmond Tutu